স্বপ্নামৃতশ্রুতি

প্রথম খণ্ড

আচার্য্য বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ

প্রকাশক ঃ
শ্রীমতী কনক বসু
'বসুমন্দির'
১৬নং নীলমণি দত্ত লেন,
কলিকাতা-৭০০০১২।

প্রথম প্রকাশ ঃ
১৬ই পৌষ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
আনন্দলোক মিশন লাইব্রেরী রাণাঘাট, নদীয়া।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

সংস্কৃত বুক ডিপো (প্রাঃ লিঃ)
২৮/৩, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

মুদ্রাকর ঃ
কৌশিক পাল
প্রিন্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা-১২।

প্রচ্ছদ ঃ
অমিতেশ দে
১০/১, নীলমণি দত্ত লেন,
কলিকাতা-১২।

।। প্রকাশের প্রাক্‌কথন ।।

গৃহবন্দী দেবেন্দ্র নাথ। অসুস্থতার কারণে ডাক্তারের বিশেষ ভাবে মানা—তাঁর কোন সভাসমিতিতে যেতে ; মানা—লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাও। তাই ইন্দ্রনীল কলকাতার বাড়ীর তিন তলার বেশ খোলামেলা রমণীয় পরিবেশে নির্জ্জনে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে তাঁর।

এ কয়েকদিন ডাক্তার ছাড়া হাতে গোনা দু-একজন আসেন তিন তলায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বা তাঁকে দেখতে, আমিও সময় পেলে কাজের ফাঁকে দু-পাঁচ মিনিট এসে বসি তাঁর কাছে। এর-ই মধ্যে একদিন চা খেতে খেতে বিকাল বেলায় তিনতলার ছাদে ব'সে ব'সে বললেন, 'ভগবৎ লীলার কত মাধুর্য্য, কিন্তু হায়! মানুষ তার বুদ্ধির দোষে, চোখের দোষে, সংস্কারের প্রভাবে, বোধের অভাবে ও অজ্ঞানতার স্বভাবে সেই লীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনা ব'লেই আজ ধর্ম্ম আমাদের কাছে মিলনের সেতু না হ'য়ে বিচ্ছেদের নদী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একে অপরের পরিপূরক না হ'য়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠেছে। এর একমাত্র কারণ হ'ল ভগবান ও তাঁর লীলা সম্বন্ধে বাহ্যিক শাস্ত্রীয় ধারণা ও আচরণ তার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারেনি বলে। শুধু শাস্ত্র জ্ঞান থাকলেই চলবে না। তার ঐ জ্ঞান তথা পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার সঙ্গে সঙ্গে চাই রসচেতনার সরস ভাবনা—তবেই ধর্ম্মের অমৃত ধারা জ্ঞানকে আন্তরিকভাবে স্পর্শ করবে।'

আমরাও সাথে সাথে অনুরোধ করি তাঁর সরস চিন্তা ভাবনাকে লেখনীর মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। তারই ফলিন, এই 'স্বপ্নামৃত শ্রুতি' যা তিঁনি ঐ অসুস্থ অবস্থাতেই কয়েকদিনের মধ্যে

লিখে ফেললেন। পাণ্ডুলিপিটি পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম ব'লেই খণ্ড খণ্ড ক'রে রসপিপাসু পাঠকবর্গকে অমৃত আস্বাদন করাতে প্রকাশ করলাম 'স্বপ্নামৃত শ্রুতি' বইটি খুবই তাড়াহুড়ো ক'রে। এই তাড়া-হুড়োতে বই প্রকাশে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেলে সহৃদয় রস-পিপাসু পাঠকবর্গ নিজগুণেই শোধন করে নেবেন, এর সঙ্গে একথাও বলি যে, যদি রসপিপাসু ভক্তজন এই বইটি পড়ে আনন্দ পান তাহলেই মাত্র আমার এই বই প্রকাশের সার্থকতা।

এই বইটি খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশের জন্য মুদ্রণের সংশোধন ও অন্যান্য কাজে অধ্যাপক ঈশান চন্দ্র দে, পার্থপ্রতিম বসু ও ইন্দ্রনীল বসুর আন্তরিক সাহায্যও কম নয়। যারা এই বইটি প্রকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য ক'রেছেন, তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সাধারণের জ্ঞাতার্থে লেখক আনন্দলোক মিশন প্রধান শ্রীবসু দেবেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন-পঞ্জী নিচে প্রকাশিত হ'ল।

ভূমিকা

আচার্য শ্রীবসু দেবেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নামৃতশ্রুতি' বইখানি যথাসাধ্য পড়েছি। 'যথাসাধ্য' বলছি এ কারণে যে, এ রচনা যে পর্যায়ের মণীষার অবদান, তার পরিপূর্ণ অনুধাবন আমার মতো একজন সামান্য প্রবর্তকের পক্ষে সম্ভব নয়।

এর আগে 'শ্রীচণ্ডী বোধাত্মিকা' বইটি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। গত শারদীয় দুর্গাপূজার কাছাকাছি সময়ে সে লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সে বই পড়ে মনের ভিতরে একটা নিবিড় প্রত্যাশা জেগেছিল। চণ্ডী ভাষ্যের পর এঁর লেখনীতে গীতার ভাষ্য যদি পাঠ করতে পাই। স্বপ্নাদ্য 'স্বপ্নামৃতশ্রুতি'তে তারই পূরণ।

ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনার বই সাধারণত গুরুসম্মিত রচনা ভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। সুহৃদ্-সম্মিত ভঙ্গি সে লেখার ভাষার চাল হয় না। 'স্বপ্নামৃতশ্রুতি' এই প্রচলিত গড়নের বড়ো সফল ব্যতিক্রম। সহজ আলাপ-চারিতার আন্তরিক নৈকট্যে এ রচনার ভাষা পাঠক হিসেবে আমাকে অনেক গম্ভীর তত্ত্ব ধারণার লক্ষ্য বেধ করিয়ে দিয়েছে। সাবলীল প্রকাশভঙ্গির প্রসাদ গুণে সমৃদ্ধ এ লেখা রসিক পাঠকের মন টানবেই। এর সঙ্গে আমাদের পুরনো দিনের কথকতার গল্প বলা এবং ব্যাখ্যা-করে-বুঝিয়ে-বুঝিয়ে কথা বলার ধরন জুড়ে গিয়ে গোটা রচনাকে আরো স্বাদু করে তুলেছে।

দৃষ্টি যতক্ষণ বহিরিন্দ্রিয়-নির্ভর, ততক্ষণ চোখ চলে মামুলি ধারণার পথ ধরে। কিন্তু ভেতরের মনে যখন চোখ ফোটে, তখন চিরকালের চেনা ছবিটাই অভাবিত এক নতুন রঙে-রসে জেগে উঠে আমাদের অবাক করে দেয়। মন তখন কবুল করে—'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই / নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'।

আমাদের আলোচ্য বই-এর সূচনা-অনুভবটি 'চোখ-গেল' পাখির সেই চোখ-যাওয়ার গহন সঞ্চার চিনিয়ে দিয়েছে। এমন ক'রে চোখ গেল ব'লেই বিল্বমঙ্গল মুগ্ধ কামনায় চিন্তামণি বারবধূ থেকে নগরের বণিকবধূতে আকৃষ্ট হয়েছিল। আবার সেই লুব্ধ বহিরিন্দ্রিয়ের বিনাশে যে অভাবিত অন্তরিন্দ্রিয়ের উদ্ভাসন হল, তার শক্তিতেই সৃষ্টি জাগলো: 'বাসনামলিন আঁখি কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,···তোমাতে হেরিব আমার দেবতা···।' ভূমির সীমা থেকে

ভূমার সীমামোচন বারে বারে মানুষের এই মর্তজীবনেই সম্ভব হয়, বহু দৃষ্টান্ত ও বৃত্তান্ত বুঝিয়ে গ্রন্থকার তাঁর ভাবনার প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে প্রকৃত প্রেম কী—বোঝাতে দুটি চরণ বেঁধেছিলেন,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

'কামগন্ধ' শূন্য উৎসর্গধর্মী ভালোবাসাই প্রকৃত মানবধর্ম, গীতাগ্রন্থের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে আচার্য বসু সেই সত্য প্রকট করেছেন। আমাদের সংস্কারান্ধ ধর্মভাবনায় সাম্প্রদায়িক আড়াআড়ি শৈবকে বৈষ্ণবের থেকে, বৈষ্ণবকে শাক্তের থেকে পৃথক করে দেয়। আমরা ভুলে যাই বৈষ্ণবের অতীন্দ্রিয় প্রেম, শাক্তের আত্মশক্তি ও শৈবের জীবকল্যাণ—এই তিন ভাবের সমন্বয়েই মানুষের পূর্ণতা। গীতা গ্রন্থের মর্ম ব্যাখ্যা করে আচার্য বসু দেবেন্দ্রনাথ ধর্মবোধে মানুষের সমগ্র হয়ে ওঠার সেই পথ নির্দেশ দিয়েছেন।

ধর্মভাবনার ভাষায় বিশিষ্ট কিছু পারিভাষিক শব্দ আমরা বুঝে / না-বুঝে অনেক সময় ব্যবহার করে ফেলি। গ্রন্থকার তাঁর লেখায় সেই ধরনের বেশ কিছু বিশিষ্ট ভাষা-প্রয়োগের ব্যুৎপত্তিগত উৎস চিনিয়ে দিয়ে আমাদের চিন্তার কুয়াশা কাটাতে সহায়তা করেছেন। ধর্ম কি? ধর্ম চর্চায় নারীর অধিকার কতটা, সাংখ্যযোগ বলতে কী বুঝব? গীতার অনুষ্টুপ ছন্দ তার যোগভাবনার অনুকূল কোন্ দিক থেকে? প্রহ্লাদ-হিরণ্যকশিপু-নরসিংহ প্রসঙ্গটি কোন্ অর্থে পরমানবিক শক্তির বিজ্ঞানসম্মত বিস্ফোরণ? গীতা কল্পনাসম্ভব যোগশাস্ত্র অথবা ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রসূত সত্য? হৃদয়, সত্য, বৃন্দাবন, অবতার, বৈষ্ণবের তিলক-সেবা—ইত্যাদি বিষয়ের মৌলিক অথচ আশ্চর্যজনক তাৎপর্য আচার্য বসু তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার বলে প্রকাশ করে লিখেছেন। জীবনের বহু অগোচর অন্ধকার বিষয় তাঁর দীপ্ত মণীষার আলোয় উদ্ভাসিত। শাণিত মননে এবং বিভোর আবেগে জিজ্ঞাসুর চিত্ত সমৃদ্ধ হবে—'স্বপ্নামৃতশ্রুতি' গ্রন্থ-খানির প্রতিশ্রুতি এই।

শিবচন্দ্র লাহিড়ি
প্রাক্তন বাংলা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

॥ লেখকের প্রত্যাশা ॥

'আনন্দরূপম অমৃতং যদ্ বিভাতি'---যা কিছুর প্রকাশ সবই তাঁর আনন্দস্বরূপ, তাঁর অমৃতরূপ, তাঁর প্রেমরূপ। এ জগৎ সংসার তাঁরই প্রেমময় আনন্দস্বরূপ। এই সংসার ভোগ ও ত্যাগ উভয়ভাবই আনে ভগবৎবোধ বা চেতনা ; অবশ্য তা ক্ষেত্রভেদে তথা অধিকারী ভেদে।

কেউ কেউ এই বিষয় সংসারকে মায়ার বন্ধন, ভগবদ্ লাভের অন্তরায় মনে ক'রে বিষয় সংসার ত্যাজ্য মনে করেন। আবার কেউ কেউ ঐ বিষয় সংসার ভোগের মধ্যেই অস্তিত্ব খুঁজে পান বা অনুভব করেন 'বিষয়ীর' তথা ভগবানের।

ভগবানের এই অস্তিত্ব ও তাঁর লীলা মাধুর্য্য মানুষ তার মনুষ্য ভাবের মধ্যে দিয়ে মনুষ্য ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করতে পারে বটে, কিন্তু তাব একটা সীমা আছে। সেই সীমাকে লঙ্ঘন করার মত ক্ষমতা নেই আমার মত অতি সাধারণ দীন ভক্তের। তাই এই সীমাকে লঙ্ঘন না ক'রে সীমাব মাঝেই অসীমকে প্রকাশ ক'রে সুধী পাঠকবর্গের কাছে তুলে ধরলাম। এ প্রকাশে ভাবের অপুষ্টি, ভাষার দৈন্য, ভক্তির অভাব থাকলেও আন্তরিকতার অভাব ছিল না মোটেই। এই 'স্বপ্নামৃতশ্রুতি' বইটি পাঠে সুধী পাঠকবর্গের তৃপ্তির বদান্যতাই আমার আন্তরিক প্রচেষ্টার মাপকাঠি।

ভাবের অপুষ্টি, ভাষার দৈন্য, ভক্তির অভাব ও অজ্ঞানতার স্বভাব চোখে পড়া সত্ত্বেও মহান পাঠকবর্গ তাদের মহত্বের গুণে 'স্বপ্নামৃতশ্রুতি' বইটি পাঠে অবহেলা করবেন না আশা করি। বইটি পাঠে কারও কারও কাছে এটি সত্য বলে মনে না হ'য়ে গল্প ব'লে মনে হতে পারে —তবে সেটা যার যা ভাব তার তাই লাভের ঘরেই পড়বে।

সকল সুধী ভক্ত পাঠকের জয় হোক্ !

শ্রীবসুদেবেন্দ্র নাথ।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

উৎসর্গ

ভক্ত-জনকে ভক্তিসুধামৃত পান করাতে ও পান ক'রতে স্নেহভাজন অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র প্রামানিক, সর্বশ্রী শশিগোপাল সরকার, অরুণ দেব, শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিশ্বজিত সাহা, সুধাময় পাল, সুধাময় চাটার্জ্জী, অনিলকুমার দে, মদন মুখার্জ্জী, গোপালচন্দ্র বসাক, জগন্নাথ মণ্ডল, অমলেন্দু চৌধুরী, অমলেশ চক্রবর্তী, মুকুল মণ্ডল, গোবিন্দ তরফ্‌দার, শেলী মুর্মু, মীরা গুপ্ত, অন্নপূর্ণা ঘোষ, শম্পা ঘোষ, মঞ্জু মজুমদার, আলপনা গাঙ্গুলী, রেবারাণী সাহা, কাবেরী মিত্র, রমা চক্রবর্তী ও শ্রীলেখা রায়ের করকমলে—'স্বপ্নামৃতশ্রুতি' বইটি উৎসর্গ ক'রলাম।

শ্রী বসু দেবেন্দ্রনাথ।



শ্রীকৃষ্ণ

ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তি মিন্দুবদনং বর্হাবতং সপ্রিয়ম্,
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরম্ পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপসঙ্ঘাবৃতম্,
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥
ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে,
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।
হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগতপতে,
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

টীকা: 'ফুল্লেন্দীবরকান্তি' অর্থে প্রেমস্বরূপ; সৌন্দর্য্যের আধার ব'লে 'ইন্দুবদন'; 'কৌস্তুভধর' তথা কুটস্থ চৈতন্য স্বরূপ; বিলাসময়ী প্রকৃতির পরমপুরুষ ব'লে 'পীতাম্বর'; 'কলবেণুবাদনপর' অর্থে কামনাশক ও চিত্তাকর্ষক।

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনী র্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥

মনের সব প্রবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের আশ্রয়ে থাকুক। আমাদের বাক্য তাঁর নামকীর্তনে ও আমাদের দেহ তাঁর প্রতি প্রণামাদিকাজে তৎপর হউক।

যৎকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥—শ্রীশুকদেব

যাঁর কীর্তন, স্মরণ, দর্শন, বন্দন, শ্রবণ ও পূজনে পাপ সব সঙ্গে সঙ্গেই চ'লে যায় সেই সুমঙ্গলকীর্তি পরমপুরুষকে করি বার বার নমস্কার।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥—গোপীস্তব

তোমার কথামৃত তাপদগ্ধ জীবের জীবনস্বরূপ। তোমার কথামৃত সব পাপদোষ নষ্ট করে, শ্রবণমাত্রই মঙ্গলপ্রদ ও শান্তিদায়ক হয়। যারা বিস্তারিতরূপে তা পান করে তারা হয় অতি পুণ্যবান। পূর্বজন্মে বহুদানের এই ফল।

যিনি বাহুবলে, যোগবলে, জ্ঞানবলে ও বুদ্ধিবলে অসৎ ব্যক্তিদের নিধন সৎ-ব্যক্তিদের রক্ষণ ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও খণ্ড খণ্ড রাজত্বগুলিকে একত্রিত ক'রে এই মহাভারতের সৃষ্টি করেছেন, সেই পরমপুরুষ দেবকীনন্দনকে করি বার বার প্রণাম।

—বসু দেবেন্দ্র নাথ

স্বপ্নামৃতশ্রুতি

শরীরটা বেশ কয়েক দিন ধ'রেই যেন ঢিমে তালে চ'লছে। শত চেষ্টা ক'রেও দ্রুততালে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল না কিছুতেই। আমার অবস্থা দেখে পার্থপ্রতিম কখন জানি আমার স্নেহভাজন শ্রীমান সুপ্রিয় গুপ্তের সঙ্গে শলাপরামর্শ ক'রে ডাক্তার ডেকে এনেছে। ডাঃ শ্যাম গোবিন্দ মজুমদার এসে নিচে আমার বসাব ঘরে বসে পার্থপ্রতিম ও সুপ্রিয়র সঙ্গে গল্প ক'রছেন। শুয়েছিলাম আমি দোতলায় আমার শোয়ার ঘরে। ইন্দ্রনীল এসে বলল, 'বাপী! নিচে চলুন, ডাঃ শ্যাম গোবিন্দ মজুমদার এসেছেন আপনাকে দেখতে।'

'সে কি-রে! কে ডাকলো ডাক্তারকে'—ব'লতে ব'লতে উঠে পড়ি আমি বিছানা থেকে।

'গুপ্তদা ডেকে এনেছেন।'

ডাক্তার আমার অপরিচিত হ'লেও—নামটা খুব ভাল লেগে গেল আমার, শ্রীকৃষ্ণের ডবল নাম শুনে। বয়স হ'চ্ছে ভেবে হয়তো ওরাই এখন আমার গার্জেন হ'য়ে উঠেছে—তাই আর কথা না বাড়িয়ে সুবোধ বালকের মতো নিচে বসার ঘরে এলে সবাই উঠে দাঁড়ান ওরা। ডাক্তার বাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম—'দাঁড়ালেন কেন বসুন বসুন'—ব'লে নিজের চেয়ারটা টেনে ব'সে পড়লাম।

সুপ্রিয় পরিচয় করিয়ে দিল ডাক্তার বাবুর সঙ্গে। ডাক্তার বাবু বললেন,—'অসুবিধাটা কি? আছেন কেমন?'

'আছি ভালই। তেমন কিছু অসুবিধা বুঝছি না? তবে একটু আধটু মাঝে মাঝে দুর্ব্বল বোধ ক'রছি।'

ডাক্তার বাবু তার ব্যাগ থেকে প্রেসার-মাপা যন্ত্রটা বার ক'রে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনার প্রেসারটা একটু দেখবো।'

'দেখবেন, দেখুন'—ব'লে হাতটা দিলাম বাড়িয়ে। প্রেসারটা দেখে বেশ গম্ভীর হ'য়ে ডাক্তার বাবু বললেন—'প্রেসারটা আপনার খুবই বেশী দেখছি সিষ্টোলিকটা ১০০-র উপর আর ডায়াষ্টোলিকটা ১২০ মতো। এ বয়সে আপনার যা হওয়া উচিৎ তা হ'ল ১৪০ থেকে ১৫০, আর ডায়াষ্টোলিকটা ৮০ থেকে ৮৫ এর মধ্যে। খুবই সাবধানে থাকতে হবে।'

'ডাক্তার বাবু!—সবই বাড়ছে, বয়স বাড়ছে—বাজারে সব কিছুরই দাম বাড়ছে, বাড়ছে রেলের টিকিট, বাসভাড়া, ট্যাক্সি ভাড়াও আর আমার প্রেসারটাই বা পিছিয়ে থাকে কেন বলুন! ওরও তো একটু আধটু বাড়তে ইচ্ছে করে। সবাই এগিয়ে যাচ্ছে দেখে ও-কি মুখ বুজে ব'সে থাকতে পারে?'

হেসে ফেললেন ডাক্তার বাবু, হেসে ফেলল সবাই—যারা ওখানে ছিল। একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সান লিখতে লিখতে ডাক্তার বাবু বললেন,—'সাবধানে থাকবেন, চলাফেরা বেশী দরকার নেই, একেবারে বেডরেষ্ট নিলেই ভাল। এই ওষুধগুলো ঠিক নিয়মমত খান, আর রক্তটা পরীক্ষা করান।'

যথারীতি শুভেচ্ছা বিনিময় ক'রে ডাক্তার বাবু সুপ্রিয়র সঙ্গে চ'লে গেলে, পার্থপ্রতিম প্রেস্‌ক্রিপ্‌সানটা নিয়ে বেরিয়ে গেল বোধহয় ওষুধ আনতে। আমিও মন্থর গতিতে উঠে এলাম দোতলায় আমার শোয়ার ঘরে। শুতে গিয়ে দেখি ইন্দ্রনীল আমার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। ও বোধহয় আমার পেছন পেছন উঠে এসেছে যদি প'ড়ে যাই ভেবে। ও আমায় বলল 'আগামী কাল থেকে উপরে শোয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেব, চুপচাপ শুয়ে থাকবেন। কোন কিছুই

ক'রতে হবে না—একদম বেডরেষ্ট, যতদিন না প্রেসার নরমাল হয়।' শুনে মনে হ'ল ও যখন পড়াশুনা করে তখন যতটা মন না দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশী মনোযোগ দিয়ে শুনেছে ডাক্তারবাবুর কথাগুলো।

রোজকার অভ্যাস মত সকালে উঠেই তিনতলার ছাদে বেড়াচ্ছি। খানিক পরে, আমার স্ত্রী যেমন তার সকালের পূজা সেরে চা ক'রে আনে দোতলায়, সেই ভেবে সিড়ির দিকে যাচ্ছি দোতলায় নামতে, সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রনীল ব'লে উঠলো—'যাচ্ছেন কোথায়—নিচে ?'

'হ্যাঁ। চা খেতে।'

'যেতে হবে না নিচে, এই ঘরে আসুন। মা এখুনিই চা নিয়ে এখানে আসছেন।'

কথামত ঐ ঘরে চ'লে এলাম আমি। চা এসে গেল। চা খাওয়ার পর ও আমায় বলল—'এইখানে শুয়ে পড়ুন। যখন যা দরকার পৌঁছে দেব আমরা— bed-rest প্রয়োজন ; রাতে শোয়ার সময় শোয়ার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বেন। নিচে নামা তো সহজ।'

'হ্যাঁ। নিচে নামা সহজ, কিন্তু উপরে উঠাই কঠিন- এটাই জগতের নিয়ম ব'লে সবাই উপরে উঠতে পারে না।'

কথাটা কানে ওর গেল কিনা বা বুঝল কিনা বুঝলাম না। বিছানায় শুয়ে পড়লাম ওর কথামতই। আমি এঘরে ঢোকার আগেই ইন্দ্রনীল বিছানাপত্র Ready ক'রে চেয়ার টেবিল ফেবিল দিয়ে ঘরটা থাকার মত বেশ গুছিয়ে দিয়েছে নিজে হাতেই।

মধ্য কলকাতার ঘিঞ্জি অঞ্চলের বড় রাস্তার প্রায় কাছে হ'লেও আমার বাড়ীর তিন তলার উত্তর-পূর্ব কোণের ঘরটা বেশ চারদিক খোলামেলা, হাওয়া বাতাসে শান্ত পরিবেশ। খাটে শুয়ে শুয়েই দক্ষিণ আকাশে সন্ধ্যার চাঁদ, উত্তর আকাশে তারা, বারান্দায় থাকা গাছপালা, ফুল-ফল, পাখী-পক্ষী সব দেখা যায়।

অনিচ্ছা হ'লেও ইন্দ্রনীলের করা রুটিন মতো দু-চারদিন বেশ

কাটিয়ে দিলাম আকাশে চাঁদ, তারা, গাছের ফুল-ফল দেখে ও পাখীদের গুন গুনানী শুনতে শুনতে। দেখা করার জন্য যারা প্রতিদিন আসতেন প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে, তাদের সঙ্গে দেখা করা প্রায় বন্ধ। তারা এলে নিচে থেকেই পার্থপ্রতিমের সঙ্গে কথা ব'লে চ'লে যেতেন বাধ্য হ'য়েই।

আজ শনিবার। দুপুরের খাওয়া সেরে শুয়ে শুয়ে ভাবছি কবির মত—'বাহিরকে দিব ব'লে কিছু রাখি নাই

সুমধুর গৃহকোণ বাছিয়াছি তাই।'

যদিও কাব্য আমার ধাতে আসে না কখনও। ভাবছি, আগামী কাল তো রবিবার—রাণাঘাট মিশনে উপস্থিত থাকার দিন। কাল তো আর শুয়ে থাকলে চ'লবে না, যেতেই হবে রাণাঘাট ; সে, যেভাবেই হোক। দক্ষিণ দিকে ছাদে টাঙ্গান কাপড় চোপড় মেলার তারটায় ব'সে একটা পাখী—'চোখ গেল' 'চোখ গেল' ব'লে শুধু চেঁচিয়ে যাচ্ছে। তখন চোখ না গিয়ে আর উপায় থাকে! ঐ দিকে তাকিয়ে দেখলাম কালো সাদা ও পাঁশুটে রং-এর পাখীটা তারে ব'সেই চোখ গেল, চোখ গেল ক'রছে। শুনে মন আমার ব'লেই ফেলল অযাচিত ভাবে মনে মনে—আরে! চোখতো যাবেই। চোখ আছে তো যাওয়ার জন্যেই—অর্থাৎ দেখার জন্য। ভাল জিনিষ দেখলে কার না চোখ যায় বলুন তো? অবশ্য খারাপ জিনিষের দিকে যে চোখ যায় না তা হলপ ক'রে বলছি না। চোখই এ দৃশ্যমান ভুবন থেকে সব কিছু তুলে মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য ও মোহ প্রভৃতির ঢেউ তোলে। তাই আমরা কাম-কামনায়, বাসনায়, যুক্ত হ'য়ে এ জগতে চলি, বলি, কাজ করি। নানাভাবে ভোগ করি এ জগৎটাকে।

এ চোখ তো দিয়েছেন আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আমাকে সব কিছুই দেখতে। তাহ'লে সব জিনিষের মধ্যে চোখ গেলে ক্ষতি কি? চোখ

গেল বলেই তো—যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, হত্যা, প্রাণত্যাগ, প্রণয়, প্রেম, ভালবাসা বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার, স্থাপত্য শিল্পকলার সৃজন ঘ'টে ইতিহাসের পাতা বৃদ্ধি হ'য়েছে—উন্মেষ ঘটেছে অতীন্দ্রিয় চেতনারও।

এ অধমের দিকে শ্রীগুরুর চোখ গেল ব'লেই তো অসীম কৃপা লাভ হ'ল—হ'ল আনন্দলোক মিশনের প্রতিষ্ঠা।

চিতোরের রাণা রতন সিংহের পত্নী রাণী পদ্মিনীর রূপলাবণ্যের ছবিতে চোখ গেল সুলতান আলাউদ্দিন খিল্‌জির। রূপলাবণ্যে মুগ্ধ নবাবের বাসনা জাগল রাণী পদ্মিনীকে নিজের ক'রে পেতে। সৃষ্টি হ'ল রাজপুতদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধের ইতিহাস। ১৩০৩ সালে সুলতান আলাউদ্দিন খিল্‌জি আক্রমণ করলেন চিতোর—সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হ'লেন রাজা রতন সিংহ। রাণী পদ্মিনী অন্যান্য রাজপুত রমণীসহ জহর ব্রত পালন ক'রে দিলেন প্রাণ বিসর্জন।

টপ্‌ ক'রে আপেল পড়ার শব্দে, চোখ গেল আপেল বাগানে ব'সে থাকা বিজ্ঞানী নিউটনের। তার থেকেই পরীক্ষা, নিরীক্ষা, যুক্তি বিচার ক'রেই আবিষ্কৃত হ'ল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের চোখ গেল বর্দ্ধমানের জায়গিরদার শের আফগান তথা আলিকুলি বেগের পত্নী ও মির্জাবেগের কন্যা বেগম মেহেরউন্নিসার দিকে। মনে উঠলো ঢেউ মেহেরউন্নিসাকে পাওয়ার। মেহেরউন্নিসাকে উপঢৌকন চাই প্রস্তাব এল শের আফগানের কাছে। বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলেন শের আফগান। সম্রাট জাহাঙ্গীর সসৈন্যে পাঠালেন কুতুবউদ্দিনকে বিদ্রোহ দমন করতে বর্দ্ধমানে। বাধল যুদ্ধ, নিহত হ'লেন কুতুবউদ্দিন ও শের আফগান দু'জনেই—নিয়ে আসা হ'ল মেহেরউন্নিসাকে তার কন্যাসহ রাজধানী দিল্লীতে ১৬০৫ সালে। অবশেষে অনেক টানা পোড়েনের পর বাদশাহের সাদি হ'ল মেহের উন্নিসার সঙ্গে ১৬১১ সালে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তার রূপে মুগ্ধ হয়ে

নাম দিলেন নূরজাহান তথা জগতের আলো ব'লে।

দিল্লীর মীর বাজারে বেড়াতে গিয়ে নাকি চোখ গেল মমতাজের দিকে সম্রাট পুত্র শাজাহানের,—অমনি প্রেম। রাজপ্রাসাদে এনে মমতাজকে বিয়ে করলেন শাজাহান। বেগমের মৃত্যুতে সম্রাট শাজাহান হ'লেন মুহ্যমান। বিবিপ্রেমের পরকাষ্ঠা দেখাতে সৃষ্টি হল পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের একটি হ'য়ে, এক সৌধ—যার নাম তাজমহল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের চোখ গেল সিমলার দত্ত বাড়ীর ৺বিশ্বনাথ দত্তের বড় ছেলে তাত্ত্বিক নরেন দত্তের দিকে। ক্রমে তার তত্ত্ব গেল, গেল ঘরবাড়ী, আত্মীয় স্বজন—হ'লেন সন্ন্যাসী—ভারতের সনাতন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠতর ক'রে তুলে ধরলেন, জগৎ সভায় তথা চিকাগো মহাধর্ম্ম সম্মেলনে।

ব্রাহ্মণ জমিদারের একমাত্র ছেলে বিল্বমঙ্গলের চোখ গেল, ওপারে চিন্তামনি বাঈজীর দিকে। চিন্তামনিকে দেখে বেহুশ হ'লেন তিনি। কোন দিকেই হুশ নেই তার। জমিদারী, পিতৃবিয়োগ, পিতৃশ্রাদ্ধ, জল-ঝড়-বজ্রপাত, নদীতে বাণ—কি আসে যায় তার। বেহুশ তিনি, গলা পচা মড়াকে কাঠ ভেবে ধ'রে উত্তাল নদী পার হ'য়ে অতি আনন্দে গিয়ে উঠলেন ওপারে চিন্তামনি বাইজীর ডেরায় অত দুর্যোগের মধ্যেই।

বিল্বমঙ্গলের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক চিন্তামনি কাঁদতে কাঁদতে বলল,—'করেছ কি ঠাকুর! যে রূপের মোহে তুমি এ চরম দুর্যোগের মধ্যেও এসেছ আমার কাছে—তার চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ পাবে ঠাকুর, যদি তুমি সেই অরূপের কাছে প্রেম নিবেদন ক'রতে পার—জীবনে শান্তি পাবে—পাবে চরম আনন্দ।'

চিন্তামনির ক্রন্দনে জীবনের মোড় ঘুরে গেল বিল্বমঙ্গলের। রূপের নেশায় মুগ্ধ বিল্বমঙ্গল অরূপের রূপ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন

নদীব ধার ধ'রে ধ'রে। ক্রমেই এগিয়ে চলছেন তিনি, জীবনের গতিও চ'ল্‌ছে এগিয়ে। একদিন নদীর ঘাটে ব'সে আছেন আনমনে, হঠাৎ তার চোখ গেল সদ্যস্নাতা এক পতিব্রতা গৃহস্থ রমণীর দিকে; আবার বেহুশ হ'লেন তিনি, ঐ পতিব্রতা রমণীকে চিন্তামনি ভেবে। পিছু নিলেন ঐ পতিব্রতা গৃহস্থ রমণীর। ভয়ে লজ্জায় ঐ রমণী নিজ গৃহে ফিরে তাড়াতাড়ি দিলেন ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে। সিক্তবস্ত্র ছেড়ে রমণী জানালা দিয়ে দেখেন, সাধুভিখারীটি বাড়ীর দিকে চেয়ে বাড়ীর দবজার কাছে আছে দাঁড়িয়ে। অবশেষে বাধ্য হ'য়ে রমণী সব কথাই বললেন তার স্বামীকে। গৃহস্বামী তখন দরজা খুলে বাইরে এসে সাধুভিখারীকে প্রশ্ন ক'রলেন,—'কি চাইছেন আপনি এখানে?'

'চিন্তামনিকে চাই', নির্দ্বিধায় বললেন বিল্বমঙ্গল।

'এখানে চিন্তামনি ব'লে তো কেউ থাকে না'—

'এই যে একটু আগে যে মেয়েটি ঢুকে গেল এই দরজা দিয়ে'—বললেন বিল্বমঙ্গল।

'ও আমার স্ত্রী।'

'ডেকে দিন তো ওকে।'

'দেখছি।' ব'লে গৃহস্বামী ভেতরে গিয়ে স্বাধ্বী স্ত্রীকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে নিয়ে এসে হাজির ক'রলেন সাধুভিখারীর কাছে।

অনেকক্ষণ পতিব্রতা রমণীকে লক্ষ্য করার পর, বেহুশ বিল্বমঙ্গলের হুশ এল। তিনি ভাবলেন তার এ চোখই তাকে বেহুশ ক'রেছে যে রূপের খোঁজে তিনি ঘর-বাড়ী, চিন্তামনি সব ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন--সেই রূপ এ চোখে দেখা যাবে না– এ চোখের সঙ্গে বোঝাপড়া চাই। তাই তিনি সাধ্বী রমণীর কাছে তার একটা খোঁপার কাঁটা চেয়ে নিয়ে, চোখ দু'টি গেলে ফেললেন নিজ হাতেই। বিল্বমঙ্গলের চোখ গেল, মানে চোখ নষ্ট হ'য়ে গেল। বাহির ইন্দ্রিয়ের চোখ গেল, বাহির দৃষ্টি হ'ল নষ্ট। এবার ক্রমে ক্রমে প্রেম সাধনায়

অন্তরদৃষ্টি হ'ল উন্মোচিত। ঐ চোখ গেল ব'লেই কি বিল্বমঙ্গলের অরূপের রূপের দর্শন মিলেছিল শ্রীকৃষ্ণরূপে ?

শ্রীবৃন্দাবনে রাধা, চন্দ্রাবলীদের চোখ গেল নন্দদুলাল কালাচাঁদের দিকে।—তার থেকেই প্রেম, সামাজিক দুর্নাম, কত নির্যাতন সহ্য ক'রে ; সেই কালাপ্রেম ক্রমে বোধি ভক্তমানুষের কাছে মহিয়সী প্রেমময়ী প্রেমস্বরূপিনী ভগবৎ শক্তি ক'রে তুলেছে তাঁদের।

জেলের পালিতাকন্যা কুমারী মৎস্যগন্ধার দিকে চোখ গেল পরাশর মুনির ব'লেই তো বৈষ্ণবদের শ্রীগীতা, শাক্তদের শ্রীচণ্ডীর রচয়িতা ব্যাসদেবের জন্ম হ'য়েছিল। রক্ষা পেয়েছিল কুরু বংশ—জন্ম হ'য়েছিল জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও ভক্ত বিদুরের। যাদের নিয়ে রচিত হ'য়েছে মহাভারত। যার পাতায় পাতায় শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয়, অশ্বত্থামা, কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী প্রভৃতি অমূল্য চরিত্রগুলি হয়েছেন চিত্রন।

মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, এক সুন্দরীর রূপলাবণ্যে চোখ গেল রাজা শান্তনুর। মুগ্ধ হ'য়ে এক সর্ত্ত মেনে নিয়ে বিবাহ ক'রেছিলেন বসুদেবতাদের অনুরোধে পৃথিবীতে আসা গঙ্গাকে, যিনি আটটি অভিশপ্ত বসুর জন্ম দিয়েছিলেন। এবং গঙ্গার কৃপায় সাতটি বসুর হ'য়েছিল সদ্য শাপমুক্তি।

স্বয়ম্বর সভায় বিদর্ভ-রাজকন্যা দময়ন্তীর চোখ গেল একই রকম রূপবান পাঁচ জন নলরাজার দিকে—কিছুক্ষণের জন্য বিভ্রান্ত হ'লেন তিনি, কে আসল নলরাজা চিনতে না পেরে ; নল ছাড়া অপর চার দেবতা নলরাজার রূপ ধ'রে উপস্থিত ছিলেন ব'লে। মনে প'ড়ে গেল রাজকন্যার,*মধু ও কৈটভের অপবিত্র মেদ থেকে এ মেদিনী তথা

*টীকা :—শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয় হ'ল অহং ও বহুত্বের প্রতীক। অহংত্বের ও বহুত্বের বাসনার নাশেই আসে দেবত্ব। তাই মধু ও কৈটভের মেদ অপবিত্র দেবতাদের কাছে।

পৃথিবীর সৃষ্টি ব'লে দেবতাদের পা পড়ে না এ পৃথিবীতে। ছায়াও তাদের পড়ে না এখানে; তখন চোখ গেল মাটীর দিকে; দেখলেন তিনি একইরূপ পাঁচ জন নলের মাত্র একজনের পা প'ড়েছে মাটীতে। বরমাল্য পরিয়ে দিলেন তার গলে। সঠিক নলরাজের সঙ্গেই বিয়ে হ'ল তার।

দশরথ নন্দন লক্ষ্মণের দিকে চোখ গিয়েছিল ব'লেই তো লক্ষ্মণকে বিয়ে করার বাসনা জেগেছিল রাবণ রাজার ছোট বোন সূর্পনখার। ফল স্বরূপ নাক গেল, কান গেল কাটা। শোকার্ত্ত বোনের এ দুর্দ্দশা দেখে রাবণ রাজার মনে জ্বলে উঠেছিল প্রতিহিংসার আগুন।

মায়াবী সোনার হরিণের দিকে চোখ গেল জানকী সীতার। প্রলুব্ধা হ'লেন তিনি। পতি রামকে পাঠালেন সোনার হরিণ ধ'রতে। রামের হাতে বাণ খেয়ে মরার আগে, হা-লক্ষ্মণ, হা-লক্ষ্মণ ক'রে চেঁচাতে লাগলো সোনার হরিণ-সাজে মায়াবী মারীচ। রামের বিপদের কথা ভেবে লক্ষ্মণকে জোর ক'রেই পাঠালেন তিনি রামের অনুসন্ধানে। এদিকে রাবণরাজা ছল ক'রে সাধু সেজে 'ভিক্ষাং দেহি' ব'লে হলেন উপস্থিত। ভিক্ষা দিতে এলে, জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে এলেন রাবণ, সীতাকে লঙ্কায় তার রাজধানীতে।—যার থেকে রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড। রাম রাবণের যুদ্ধ। ছোট ভাই বিভীষণের স্ত্রী ও কয়েক জন পুত্র ছাড়া যুদ্ধে সবংশে নিধন হ'লেন লঙ্কেশ্বর রাবণ।

ব্রহ্মশক্তি লাভ ক'রতে রাজ্য, রাজসুখ ছেড়ে তপোবনে এলেন রাজা বিশ্বামিত্র। চ'ললো কঠোর তপস্যা, সাধনা; হঠাৎ চোখ গেল তার স্বর্গ-নর্ত্তকী সুন্দরী অপ্সরা মেনকার রূপ-লাবণ্যের দিকে। জপ গেল, তপ গেল—মেনকা-সুন্দরী-সঙ্গ আসক্তিতে মজলেন সর্ব্বসুখ পরিহার ক'রে তপোবনে আসা রাজা বিশ্বামিত্র।

কে শোনে কার কথা। এত কথা শুনেও পাখী তুমি চোখ গেল, চোখ গেল ক'রছো? আসলে বলতো তুমি কার চোখ গেলর কথা

ব'লছো··· ? রাধা, চন্দ্রাবলীদের,---না বিল্বমঙ্গলের ?

শব্দ মাত্রেই ব্রহ্মময় ও অন্তর্নিহিত ভাবযুক্ত, তা সর্ব্বজন সম্মত। চোখ গেল ব'লে পাখী কি বুঝাতে চাইছো? পাখী বলছে চোখ গেল=চ+ও+খ+গ+এ+ল; 'চ' অর্থে চেতনা, 'ও' মানে সব, 'খ' মানে আকাশ তথা উর্দ্ধ, 'গ' মানে গতি, 'এ'=অ+ই, 'অ' মানে ব্রহ্ম, 'ই' মানে তাঁর শক্তি, 'ল' মানে লাভ করা বা বহন করা। পাখী বলতে চাইছে চেতনা সব উর্দ্ধগতি হ'য়ে ব্রহ্মশক্তি লাভ করে বা বহন করে। অর্থাৎ সব চেতনাই ব্রহ্মময়।

আরে সবই সমান—দুই তো হয় একের সঙ্গে এক মিলেই।

বাহ্যদৃষ্টিতে তন্ময় হ'য়ে রাধা, চন্দ্রাবলীদের দেখা চাই; আবার বাহ্যদৃষ্টিহীন হ'য়ে অন্তরদৃষ্টি দিয়ে বিল্বমঙ্গলের মতও দেখা চাই। বাহ্য ইন্দ্রিয় চেতনাকে অতীন্দ্রিয় চেতনার সঙ্গে, জগৎ বোধকে ভগবৎ বোধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেওয়া চাই, তবেই তো সাগরে মিশে নদীর জল, খালের জল, নালার জল সব একাকার হ'য়ে শুধু জল আর জল হ'য়ে যাবে।

সমাহিত হ'য়ে বাহ্যদৃষ্টি দিয়ে শ্রীগীতাকে যেমন দেখতে হবে ঠিক তেমনি দেখতে হবে আন্তর্দৃষ্টি দিয়েও, তবেই সাধকপ্রবর নররূপী শ্রীঅর্জ্জুনের আত্মজিজ্ঞাসা ও শ্রীগুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের সমাধান বাণীর মর্মকথা অনুভূত হবে। শ্রীগীতা শুধু নারায়ণের কথা নয়—নর ও নারায়ণের কথোপকথন।

হে করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগতপতি কৃপা ক'রে আমাকে তোমার অসীম রূপ অনুভব করার ক্ষমতা দাও যাতে আমার অনুভূতিতে অনুভূত হয় ভক্ত সাধকপ্রবর শ্রীঅর্জ্জুনের সাধন আকুতি ও তোমার সাধন-নির্দ্দেশ।—'কিং কুর্বত' দিয়ে শ্রীগীতার মধ্যে যে জিজ্ঞাসা এসেছিল ভক্তমনে, তোমার বিশ্বরূপ দর্শনে সদা প্রণত হ'য়ে হৃদয়ে জেগেছিল 'করিষ্যে বচনং তব'—ভাবের।

ভাবতে ভাবতে ভাতঘুম এসে যে কখন আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে তার ঠিক নেই। স্বপ্নে দেখছি হাঁসিমাখা মুখে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছেন। আমি নানান প্রশ্ন করছি. অম্লান বদনে সব কিছুর উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন।

'আশা থাকলেও ভয় জাগে মনে, দুটি কথা ভেবে।' বললাম আমি।

এক হ'ল—তোমাকে সেবা করে ব'লে সবার চোখে বৈষ্ণব ব'লে পরিচিত যারা, তাদের কেউ কেউ বলে আমি নাকি মাতৃতন্ত্রের নরাধম। আমার পক্ষে শ্রীগীতা তথা শ্রীকৃষ্ণের বাণীর মর্মকথা উপলব্ধি অসম্ভব।

দ্বিতীয় হ'ল—বাধালে তুমি বাধ্য, না হ'লে কি জীবের সাধ্য তোমাকে ও শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি তোমার নির্দ্দেশ বুঝতে বা জানতে পারে?

তাছাড়া,—আমি তো মাতৃসাধক। আমি কি তোমার কথার মর্ম বুঝতে পারবো?'

শুনে প্রভু হেসে বল্লেন, 'সে কিরে. তুই এ কট্ আগেই বলছিলিস্ না পাখীকে--দুই তো কিছুই নয়, একের সঙ্গে এক মিলেই হয়। তবে তুই দুই দুই ভাবছিস্ কেন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে আমিই তো কুন্তী-নন্দন অর্জ্জুনকে আত্মস্থ ও আত্মশক্তি লাভের জন্য শ্রীদুর্গা স্তব করতে বলেছিলাম। আমিইতো জীবকল্যাণার্থে অর্জ্জুনকে পাশপত অস্ত্রলাভের জন্য শিবের আরাধনা করার উপদেশ দিয়েছিলাম। বৃন্দাবনে রাধাদি গোপীদের সঙ্গদান কালে আয়াণ ঘোষকে দেখে ভীতা সন্ত্রস্তা রাধাকে রক্ষা করার জন্য কালীরূপ ধারণ ক'রেছিলাম।

বৈষ্ণবের অতীন্দ্রিয় প্রেম, শাক্তের আত্মশক্তি ও শৈবের জীব-কল্যাণ, এই তিন ভাবের সমন্বয়েই মানুষের পূর্ণতা।

শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয় কারণ শব্দের মধ্যে গুপ্ত চৈতন্যশক্তি আছে —যা ক্ষেত্র ও অধিকারী ভেদে এক এক জনকে এক এক রকম ভাবে উদ্রিক্ত করে। যেমন—বেলা যায়, বাস্‌নায় আগুন দাও—রজক-কন্যার এই কথাটি রজককন্যার বাবার অর্থাৎ রজকের মনকে ব্যস্ত করেছিল কলার বাস্‌না তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে ক্ষার তৈরী করতে; গৃহে প্রত্যাবর্তনরত জমিদার লালাবাবুকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললো আর একভাবে অর্থাৎ আত্মিক চেতনায়। রজক কন্যার ঐ কথায় লালা-বাবুর হুশ এল। ভাবলেন, সত্যিতো বেলা যায় যায় হয়েছে—জীবনে সন্ধ্যা আসতে তো আর বেশী দেরী নেই অর্থাৎ বয়স হ'য়েছে।

জাগতিক কামনা বাসনায় মত্ত থাকলে তো আর চ'লবে না। এ কামনা বাসনাকে জ্ঞানাগ্নিতে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেওয়া চাই। পাল্কি-বাহকদের আদেশ দিলেন পাল্কি নামাতে। নামল পাল্কি ভূমিতে। পাল্কি থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। নির্দ্দেশ দিলেন পাল্কিবাহকদের পাল্কি নিয়ে তার বাড়ী ফিরে যেতে। পাল্কি চ'ড়ে লালাবাবুর আর বাড়ী ফেরা হ'ল না। নিজে সব বাসনায় আগুন দিয়ে বাসনাশূন্য হ'য়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি আত্মানুসন্ধানে। —হ'লেন সন্ন্যাসী।

ঐ রজককন্যার কথা হৃদয়ে গ্রথিত হ'য়ে ভগবৎ অনুগ্রহে ঘটেছিল লালাবাবুর জীবনে শক্তিপাত।' [স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে শক্তিপাত কি? শক্তিপাত সম্বন্ধে জটিল তত্ত্বে না গিয়ে সহজ ক'রে বলা যায় ভগবৎ কৃপা। জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলে মানুষের মধ্যে যে মলের সৃষ্টি হয় সেই মলে জীবাত্মা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হ'য়ে এ জগতে বার বার জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ ক'রে থাকে। বার বার জন্মগ্রহণ ও ও মৃত্যুবরণ ক'রতে ক'রতে সুকর্ম্মানুসারে মল পরিপক্ক হ'লে শক্তি-পাত ঘটে। মল পরিপাকের তারতম্য অনুসারে শক্তিপাতেরও তারতম্য ঘ'টে থাকে। তীব্র-তীব্র, তীব্র-মধ্য, তীব্রমন্দ, মধ্যতীব্র, মধ্য-মধ্য, মধ্য-মন্দ, মন্দ তীব্র, মন্দ-মধ্য, মন্দ-মন্দ প্রভৃতি 'ন'—ভাবের

শক্তিপাত পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন কারণ ও বিভিন্ন কর্মানুসারে শক্তিপাত ঘ'টতে দেখা যায়। বর্ত্তমান জীবনে আত্মবিস্মৃতি ঘটলেও হঠাৎ কিছু দর্শন ও শ্রবণ অনুভূতি থেকে পূর্ব্বজন্মের সুকর্ম্মের ফলে তীব্র-তীব্র শক্তিপাত ঘ'টতে দেখা যায়—যা লালাবাবুর জীবনে ঘ'টেছিল।]

'আমার বাঁশী শুনে রাধা ভাবে বাঁশী ব'লছে—জলে এসো রাই, সুবল. সুদামাদি ভাবে গোঠে চলো ভাই ব'লে বাঁশী বাজে, আর মা যশোদা ভাবেন, ননী চাই, ননী চাই ব'লে আমার বাঁশী ধ্বনি তুলছে। আমার এ বাঁশীর সুর ক্ষেত্রভেদে, ভাবভেদে বিভিন্ন রকম। কারুরই শুনা ভ্রান্ত নয়, তবে একান্ত সত্যও নয়। প্রত্যেকের শুনাই এক একটি নিজস্ব ভঙ্গী মাত্র. আমার বাঁশীর শব্দ যে যার নিজস্ব বোধেই উপলব্ধি করবে—ঐ বাঁশীর শব্দ এক ও অনন্ত যুগপৎ দুই। যেখানে সব ভাবের ও সব ভাবনার মিলন সেইখানেই মাত্র আমার স্থিতি। আমার আবির্ভাব।

আমিই শাক্তের কালী, বৈষ্ণবের শ্রীবিষ্ণু, শৈবের পরমশিব। আমিই সব, আমি ছাড়া এ জগতে আব কিছু নেই। আমি তো অর্জ্জনকে বলেছিলাম —

'যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥' গীঃ ১০/৩৯

(হে অর্জ্জুন সর্ব্বভূতের যা কিছু মূল কারণ তাই আমি, এ চরাচরে আমি ছাড়া কোন বস্তু হ'তে পারে, এমন কোন বস্তুই নেই।)

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহংহুতম্॥ গীঃ ৯/১৬

*বিঃ দ্রঃ—শক্তিপাত সম্বন্ধে আমার লেখা 'জপাৎ সিদ্ধি' কিংবা মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত গ্রন্থটি প'ড়লে বিশদভাবে জানা যাবে।

'পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ।। গীঃ ৯/১৭
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।।' গীঃ ৯/১৮

(আমিই ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, খাদ্য, অগ্নি, হোম। আমিই এ এজগতে পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ ; আমিই বেদ ও পবিত্র বস্তু, ওঁঙ্কার, ঋক, সাম, যজুর্বেদ ; আমিই জীবের গতি, ভর্ত্তা, স্বামী, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব ; আমিই প্রলয়, স্থান, নিধান ও অবিনাশী বীজ স্বরূপ।)'

'প্রভু তুমিই যদি বৈষ্ণবের শ্রীবিষ্ণু, শৈবের পরমশিব ও শাক্তের শক্তিরূপিনী মা হও ; তা'হলে আমি কি ? শাক্ত, শৈব না বৈষ্ণব ? তুমি যখন যা রূপ নেবে আমি তখন হব কি তারই সেবক মাত্র ? তুমি যখন শক্তিরূপিনী মা হবে, তখন আমি শাক্ত, যখন পরমশিব হবে, তখন আমি শৈব আর যখন তুমি বিষ্ণুরূপ ধারণ ক'রবে তখন আমি বৈষ্ণব হবো। কি বলো ?'

'তথাস্তু।'

'কি বল্‌লে ?'

'তথাস্তু, তাই হবে, তাই হবে, তাই হবে।'

'তুমি তো তথাস্তু ব'লেই খালাস।'

'তোমার তো আমার মতো লোকভয় নেই। তাছাড়া তোমাকে পাবেই বা কোথায় যে তোমাকে ধ'রে হেনস্তা ক'রবে কিংবা তোমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে ? কিন্তু আমি যদি একবার মুখ ফস্‌কে ব'লে ফেলি —আমি বৈষ্ণব, তাহ'লেই হ'য়েছে। ঠ্যালা সামলানো দায় হ'য়ে পড়বে--তোমাকে ডাকার ফুরসতও মিলবে না। শ্রীরামকে কিংবা তোমাকে তথা কৃষ্ণকে পূজা করা সমান ব্যাপার ; কারণ দু-জনেই তো বিষ্ণুর অবতার। তা সত্ত্বেও ইষ্ট-নিষ্ঠার নামে রামের

ভক্তরা যেতে চান না কৃষ্ণমন্দিরের দিকে ; আবার তোমার ভক্তদেরও ঐ একই অবস্থা, তারাও যেতে চান না রামের মন্দিরের দিকে। তোমাকে পূজা করা, আর রামকে পূজা করা তো সেই বিষ্ণুকেই পূজা করা। ধর্ম্মক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাব এত প্রবল হ'য়ে দাঁড়ায় যে ভাগবত পর্য্যন্ত নিজের সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া অন্য কারো কাছে শুনতে চায় না। শিবকাঞ্চির শিবভক্তরা বিষ্ণুকাঞ্চি মন্দিরের চূড়া দেখে ফেলার ভয়ে পূর্বদিকে পর্যন্ত তাকান না। কেদারে যারা যান, তারা বদ্রীনাথে যান না।

একবার রামভক্ত তুলসীদাসের জীবনে ঘ'টলো এক ঘটনা—একদিন রামভক্ত তুলসীদাস শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে "জয় সীতারাম—জয় জানকী-জীবন-কোশল কিশোর দশরথ নন্দন" বল'তে ব'লতে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখতে মন্দিরে ঢুকতে গেলে শ্রীকৃষ্ণভক্ত পূজারী ব'ললেন—"আপনি এখানে কোথায় পাবেন সেই কোশল কিশোর শ্রীরামকে। রাধারাণীর রাজত্বে শ্রীকৃষ্ণ মিলতে পারে—রাম মিলবে অযোধ্যায়।"

তুলসীদাস ব'ললেন—"কেন তিনি যে অর্জ্জুনকে বলেছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম্।" এ বচন তাঁর মিথ্যা হ'তে পারে কি?

মন্দিরের পূজারী বল্‌লেন—"যদি তা না হয়, তাহ'লে আপনি কৃষ্ণ মূর্ত্তিতেই রামকে দেখুন।"—ব'লে মন্দিরের দরজা দিলেন বন্ধ ক'রে।

রামভক্ত তুলসীদাস তখন আর কি করেন, তিনি সেখানে ব'সে ব'সে গদগদ কণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন ভগবানকে।

"ক্যা কহু ছবি আজকী, ভলে বনেহো নাথ।
তুলসী মস্তক তব নমে, জব ধনুষবাণ লিও হাথ॥"

ভক্তের কাতর প্রার্থনা নাকি তুমি নামঞ্জুর ক'রতে পার না। তাই শ্রীতুলসীদাসের তোমাকে রামরূপে দর্শনের ইচ্ছাকে তুমি প্রতিহত

না ক'রে মুরলী পরিহার ক'রে ধনুর্বাণ হাতে দাঁড়িয়েছিলে ব'লে শুনেছি।

"মুরলী মুকুট তুরায়কে ধনুষর্বাণ লিয়ো হাথ।
অপনে জনকে কারণে শ্রীকৃষ্ণ ভয় রঘুনাথ।।"

এসব শোনা কথা—কথা থেকে যায় মনে-প্রাণে আস্তিক্যেব বোধ 'আসে না ব'লেই, কথা গাঁথা হ'য়ে থাকে মাত্র, সত্যানুভূতি হয় না।'

শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—'চৈতন্যদেব ব'লেছেন'

"যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।"

পরম বৈষ্ণব সাধক নীলকণ্ঠ বৃন্দাবন থেকে সশিষ্য প্রত্যাবর্তনকালে পথমধ্যে কালীমন্দির দেখে শিষ্যদের নিষেধ সত্ত্বেও মন্দিরের দরজা খুলে মা-কালীকে দেখে ভক্তিভরে গেয়ে উঠেছিলেন—

"হরি তোমার মাতৃরূপ সর্বরূপ সার!
পিতৃরূপে দিয়ে জন্ম, মাতৃরূপে দাও মুখে স্তন্যধার।।"

শাক্ত সাধক কমলাকান্ত গান গেয়েছেন—

"শ্যামা কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি, কখনও শূণ্যকার হে।

মাতৃসাধক রামপ্রসাদ গাইলেন—

"কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

তাঁরা তো সবাই কথা ও গানের মধ্যে সবাইকে শিক্ষা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—কালী-কৃষ্ণে, আকারে-নিরাকারে নেই কোন ভেদ।

রামকৃষ্ণও তো ব'লেছেন—

"যত মত তত পথ।"

'তাতো ঠিকই ঠাকুর! কথাটা মিথ্যে না। তবে কি জান—তাঁদের মত তাঁরা বলেছেন ভক্তরা আবার তাদের নিজেদের মতো ক'রে বুঝেছেন ব'লেই—এ বোঝানো আর বুঝার মধ্যে পার্থক্য র'য়ে গেছে অনেক। যার ফলে ভক্তরা এত ভক্ত ও তাদের এত ভক্তি যে'

কেউ কাউকে সহ্য ক'রতে পারে না তোমাকে খুব বেশী শ্রদ্ধা-ভক্তি করে দেখাতে গিয়ে। যেমন ধর, তোমার খাঁটি-ভক্তদের আবার কেউ কেউ কোন দেবীর মন্দির কিংবা শিবের মন্দির দেখলে তিন হাত দূর দিয়ে চ'লে যায়। এমন কি দুর্গা-নাম উচ্চারণ ক'রতে হ'লে শক্তি-গন্ধে ইষ্ট-নিষ্ঠা খর্ব হওয়ার ভয়ে গণেশের মা' ব'লে থাকে। পূজায় ফলমূল দিতে হ'লে কেটে-কুটে দিতে হয়। এই কাটা-শব্দটার মধ্যেও নাকি তারা শক্তি বা শক্তের গন্ধ পান বলে—কাটা-শব্দটা উচ্চারণ না ক'রে কাটাকে বানানো ব'লে থাকেন।'

'যে যা বলে বলুক! তোর তাতে কি আসে যায়। আরে শাস্ত্র পড়েছিস তো তাতে গুণীজনেরা তথা প্রজ্ঞাবান ঋষিরা ব'লেছেন—যিনি উত্তম তিনি সবার সঙ্গেই চলেন। যিনি মধ্যম তিনি চলেন ভেদের মধ্য দিয়ে তফাৎ ক'রে। তাই কবি বলেছেন—

"উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।"

আবার তোদের রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন—

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।"

'যাই বল, তাই বল ঠাকুর! ছোটবেলায় শুনেছিলাম মায়ের মা দিদিমার কাছে—কানা, খোঁড়া, কালা, বাঁকা নাকি তিনগুণে হয় বাড়া? তোমার বঙ্কিম ভাব, তাই তুমিও এ যুগের কবিদের মত—দেবে আর নেবে, মেলাবে মিলিবে—এর ফরমূলায় কিছু কিছু কথা অর্জ্জুনকে ব'লেছো—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ॥" গীঃ ১৮/৬৬

কথার মধ্য দিয়ে। তুমি দুটো কাজ ক'রবে অর্থাৎ ভক্তের সব পাপ মুক্ত ক'রবে আর তাকে শোক রহিত ক'রে মোক্ষ দান করবে তখন, যখন

ভক্ত দুটো কাজ অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রবে ও তোমার প্রতি শরণাগত হবে। বা ঠাকুর, বা! বা! দুটো কাজ ভক্ত ক'রলে তবেই তুমি দুটো কাজ ক'রবে তার। অবশ্য প্রস্তাবটা ভাল, কেউ কাউকে ঠিক ঋণী বা ধনী ক'রলো না এ ফরমূলায়। ও বুঝেছি ব্যাপারটা, আমার বুদ্ধি একটু দেরীতে কাজ করে। আসলে তুমি নাকি ভক্তগত প্রাণ, তাই ভক্তকে ঋণী ক'রে ছোট ক'রতে তোমার প্রাণ চায় না।

সর্ব্বধর্ম্ম কি? যেটাকে তুমি পবিহার ক'রতে ব'লছো? সর্ব্বধর্ম্ম ব'লে এটাই কি বুঝাতে চেয়েছো যে তমঃ. রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি মানুষের মধ্যে সহজাত ভাবেই বর্তমান থাকে। জন্মগত অধিকার বলে তমোগুণ প্রভাবে মানুষ কর্ম্মময়ী প্রকৃতির. রজোগুণ প্রভাবে ভক্তিময়ী প্রকৃতির ও সত্ত্বগুণ প্রভাবে জ্ঞানময়ী প্রকৃতির অধিকারী হয়। মনুষ্য ধর্ম্মরাজ্যে তিনটি ক্ষেত্র বর্তমান—(১) কর্ম্মক্ষেত্র, (২) ভক্তিক্ষেত্র ও (৩) জ্ঞানক্ষেত্র। এই তিনটি ক্ষেত্রেই তার অহংত্বের প্রকাশ দেখা যায়। অহংকারই মানুষের অভিমান ব'লে পরিজ্ঞাত। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মাভিমানের, ভক্তিক্ষেত্রে ভক্তাভিমানের ও জ্ঞানক্ষেত্রে জ্ঞানাভিমানের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই অভিমান বা অহংকারই তোমার বাণী শ্রীশ্রীগীতায় 'সর্ব্ব' ব'লে এবং কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মাভিমান ভক্তিক্ষেত্রের ভক্তিভিমান ও জ্ঞানক্ষেত্রে জ্ঞানাভিমান সর্ব্বধর্ম্ম ব'লে অভিহিত। ঐ তিন প্রকার অভিমানের প্রত্যেকটি ছয় ভাগে বিভক্ত। অতএব (৩×৬=১৮) আঠারো প্রকার অভিমানের প্রকাশ দেখা যায়, আর এই এক এক প্রকার অভিমান—১ম অধ্যায়ে মমত্বাভিমান, ২য় অধ্যায়ে সত্ত্বাভিমান, ৩য় অধ্যায়ে কর্ম্মাভিমান, ৪র্থ অধ্যায়ে জ্ঞানাভিমান, ৫ম অধ্যায়ে কর্তৃত্বাভিমান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানাভিমান, ৭ম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানাভিমান, ৮ম অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞানাভিমান, ৯ম অধ্যায়ে বিদ্যাভিমান, ১০ম অধ্যায়ে ঐশ্বর্য্যাভিমান, ১১শ অধ্যায়ে রূপাভিমান, ১২শ অধ্যায়ে ভক্তাভিমান,

১৩শ অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষ জ্ঞানাভিমান, ১৪শ অধ্যায়ে গুণাভিমান, ১৫শ অধ্যায়ে পুরুষাভিমান, ১৬শ অধ্যায়ে সম্পদাভিমান, ১৭শ অধ্যায়ে শ্রদ্ধাভিমান ও ১৮শ অধ্যায়ে মোক্ষাভিমান নিয়ে ১৮টি অধ্যায়ে রচিত হয়েছে শ্রীশ্রীগীতা।

তমোগুণযুক্তা কর্ম্মময়ী প্রকৃতিকে 'অবিদ্যা' ও সত্ত্বগুণযুক্তা জ্ঞানময়ী প্রকৃতিকে 'পরমা' বলা হয়। যোগীগণ দেহস্থ সপ্তচক্রের মধ্যে এই কর্ম্মময়ী প্রকৃতিরূপী অবিদ্যা', ভক্তিময়ী প্রকৃতিরূপী 'বিদ্যা' ও জ্ঞানময়ী প্রকৃতিরূপী 'পরমার' ক্ষেত্রগুলিকে দেহস্থ 'মূলাধার' চক্রথেকে 'অনাহত' চক্রের নিম্নদেশ পর্যন্ত অবিদ্যার, 'অনাহত' চক্র থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত বিদ্যার এবং আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধদেশ থেকে সহস্রারচক্র পর্যন্ত পরমার ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

দেখ ঠাকুর! আমার বুদ্ধিটা একটু কম। তাই সব কথা ঠিক ঠিক সময়মত গুছিয়ে তোমায় ব'লতে পারছি না বা জিজ্ঞেস ক'রে নিতে পারছি না। এই দেখ, এই বুদ্ধি কমের জন্যই তো নিত্যবস্তুকে ফেলে অনিত্য বস্তু নিয়ে মশ্‌গুল থাকার জন্যই তো আমার এ জগতে বার বার যাতায়াত। আচ্ছা ঠাকুর, বৈষ্ণবরা বোধহয় খুব বুদ্ধিমান না? তারা তাদের কপালে তোমার পদচিহ্ন স্বরূপ তিলেক এঁকে বুদ্ধি ক'রে বুদ্ধিটাকে স্থির প্রজ্ঞাযুক্ত ক'রে নেওয়ার ব্যবস্থা ক'রেছে। এ জগতের সব কর্ম্মকাণ্ড যার দ্বারা সমাপন হয় সেই দেহস্থ বাহুদুটিতে তোমার পদযুগল স্বরূপ তিলেক এঁকে সকল কর্ম্ম প্রবৃত্তিমুখী না ক'রে নিবৃত্তিমুখী করার ব্যবস্থা ক'রেছে। মানুষের হৃদয়ে সব সময় এ জগতবোধের আহরণ চ'লছে, একটুও তার বিরাম নেই —বিশ্রাম নেই। অবশ্যি হৃদয় কথাটা এসেছে হৃদ্ ধাতু থেকে যার অর্থ আহরণ। এ জাগতিক আহরণ বন্ধ না করলে তোমার রূপ, তোমার চাওয়া, কিছুই উপলব্ধি করা যাবে না ভেবেই তারা বুদ্ধি ক'রে তোমার পদচিহ্ন স্বরূপ তিলেক বক্ষে অঙ্কন ক'রে চিত্তকে জাগতিক

ভাব ভাবনার দিকে বিক্ষিপ্ত হ'তে না দিয়ে অতীন্দ্রিয় চেতনার সঙ্গে যুক্ত করার পথ প্রশস্ত ক'রে রেখেছে!

ঠাকুর! আমাকে—এই নির্ব্বোধ লোকটাকে একটু তোমার ভক্তির অমৃত খাইয়ে দাও না যাতে বুদ্ধিট স্থির রাখতে পারি ভগবৎ চেতনার সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে। তাই উপনিষদের ঋষিকণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রার্থনা করি তোমার কাছে—অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মহমৃতং গময়, আবিরাবী র্ম এধি॥

আমার কথা শুনে প্রজ্ঞাবানেরা বলেন, ব্যাস রচিত শ্রীগীতা পাঠে তোমাকে জানার পথ সহজ হয়। কিন্তু ঠাকুর—ব্যাস মানে যে বিভক্ততা। এই ব্যাসচেতনা কি তোমার সঙ্গে আমাকে যুক্ত ক'রতে পারবে?'

"ব্যাস মানে যদিও বিভক্ততা, তবু ব্যাস-চেতনা হ'ল নেড়ে, ঘেটে, দেখে, শুনে, কেটে-কুটে ভাল ক'রে বোঝা-জানা। তবেই তো যুক্ত হওয়া বা মিলন।"

'ও ঠাকুর! তাই কি খণ্ড খণ্ডাকারে দেহকে ধ্যাসন করেন ব'লেই সাধকরা তার চিহ্নস্বরূপ তুলসীকাঠকে খণ্ড খণ্ডাকারে গ্রথিত ক'রে গলায় ধারণ করেন? তুমি কি চাইছ ঠাকুর অর্জ্জুনের প্রতি তোমার সাধন নির্দ্দেশ ভাল ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানবার জন্য বহিঃ ও আন্তঃ ভাবগুলি নিজের কাজের সঙ্গে মিলিয়ে নিই। তুমি শ্রীঅর্জ্জুনকে যা নির্দ্দেশ ও উপদেশ দিতে অর্জ্জুন তা ঠিক ঠিক অনুধাবন না ক'রতে পেরে তোমাকে প্রশ্ন ক'রেছিল ঃ—

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥ গীঃ ১/৩২
তে ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥ গীঃ ১/৩৩
আচার্য্যঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥ গীঃ ১/৩৪

হে গোবিন্দ আমাদের রাজ্য সুখভোগ বা জীবন ধারণের প্রয়োজন কি? যে সব আচার্য্য, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ ও আত্মীয়স্বজনগণ যাদের নিমিত্ত সুখ ও এ রাজ্যভোগ তাঁরাই এই যুদ্ধে ধনসম্পদ ও প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত।

নানারূপ প্রশ্নের উত্তর দিয়েও যখন তুমি বুঝলে এখনও অর্জ্জুন তোমাকে তথা তোমার নির্দ্দেশ সঠিকভাবে কার্য্যকরী করতে পারছে না তখন তুমি তাকে তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করাতেই তিনি বলেছিলেন :—

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ গীঃ ১১/৩১

(হে দেবশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে আদিপুরুষ! তুমি কে? তোমাকে আমি জানতে চাই; তোমার কার্য্য-কারণের উদ্দেশ্য; তোমার স্বভাব কিছুই আমি জানি না।)

যে অর্জ্জুন সদাসর্ব্বদা তোমাকে বন্ধুরূপে, সখারূপে পেয়েও তোমার কার্য্য-কারণ, তোমার বাণী বা উপদেশ তথা সাধন নির্দ্দেশ অনুধাবন ক'রতে সমর্থ নন, আমার মত অতি সাধারণ কেবল সংসার ভাবনায় মত্ত আত্মবিস্মৃত অল্প বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কি তোমার সখা অর্জ্জুনকে দেওয়া নির্দ্দেশ, উপদেশ যা মহামতি ব্যাসদেব শ্রীগীতারূপে সবার কাছে প্রকাশ ক'রেছেন, তা কি হৃদয়ঙ্গম্ করা সম্ভব? যদিও বর্ত্তমানে বহু পণ্ডিত মনীষা খুব সহজ করেই এর ব্যাখ্যা ক'রে আমাদের বোঝার জন্য তুলে ধরেছেন। প্রভু! সব দেখে শুনে এ অবোধের বোধে এসেছে যে, অন্তরে শ্রীঅর্জ্জুন ভাব এসে সাধন আকুতি না জন্মালে এবং অর্জ্জুন-সখা হ'য়ে অর্থাৎ তুমি

হ'য়ে কেউ না বুঝিয়ে দিলে শ্রীগীতার মর্মবাণী বোধে আনা শক্ত আমার কাছে। তুমি না বুঝিয়ে দিলে আমি বুঝবো কি ক'রে? তুমি বাপু আবার কিছু না ক'রলে কিছু করো না। এমন কিছু ভাল কাজ করিনি, যাতে তুমি বুঝিয়ে শুঝিয়ে এই বোধ-বুদ্ধিহীন লোকটাকে বুদ্ধিমান বানিয়ে দেবে। তুমি বরং আমার মধ্যে একাধারে অর্জ্জুন-ভাবের উদয় ঘটিয়ে জীবন-জিজ্ঞাসার আকুতি জাগিয়ে তোলো, আর অপর ধারে আমার অস্থির বুদ্ধিতে তোমার চরণ স্থাপন ক'রে পরাবোধ জাগিয়ে দাও। তাহ'লে আমি তোমার কৃপাবলে একাধারে অর্জ্জুন তথা নর হ'য়ে জীবন-জিজ্ঞাসা করি আবার পরাবুদ্ধি শ্রীগীতার সঞ্জয়* হ'য়ে জীবন-যুদ্ধের সব সঠিক ঘটনা প্রকাশ ক'রে ক্রমঅগ্রসরের কর্ত্তব্য ঠিক করি।

সুখের বিষয় তুমি আশ্বস্ত হওয়ার জন্য গ্যারান্টি দিয়ে এই ব'লেছ—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ গীঃ ৪/৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীঃ ৪/৮

(যখন ধর্ম্মের হবে পতন অধর্ম্মের ঘটবে অভ্যুত্থান তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি তথা নরদেহ ধারণ করি। সাধুদের রক্ষার জন্য দুষ্ট দমন ক'রে ধর্ম্মকে সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।)

সত্যি কথা ব'লতে কি ঠাকুর তোমার এ 'গ্যারান্টি'তে কেউ ভরসা

---

* টীকা : সঞ্জয় = সং + জয় অর্থাৎ ভূতপ্রপঞ্চকে কারণ, কার্য্য, গুন ও অর্থের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে বা পরিচিত হ'য়ে যে স্মৃতি-তাই সঞ্জয়। সাধক যখন আজ্ঞার নিচের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ ক'রে ভূতজগতের লীলা দেখে, তখন বিষয় মাত্রই তার কাছে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হ'য়ে যায়। এই অনাসক্ত দৃষ্টিই দিব্যদৃষ্টি তথা সঞ্জয়।

বা বিশ্বাস রাখতে পারে না। কারণ দুটি। প্রথমটি হ'ল মানুষ নিজে নিজেকেই বিশ্বাস করে না ও নিজেও অপরের বিশ্বস্ততার কাজ করে না। দ্বিতীয়টি হ'ল—তোমার কথা সঠিক উপলব্ধি ক'রতে না পারায় মনে হয় তুমি সব গোলমেলে কথা ব'লেছো শ্রীগীতায়। তাই সাধারণের চোখে তোমার দেওয়া 'গ্যারান্টি'তে তিনটি প্রশ্ন থেকে যায়।

এক হ'ল—যখন ধর্ম্মে গ্লানি এসে অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে সাধুরা নির্যাতিত হন, তাদের রক্ষার্থে ও ধর্ম্মসংস্থাপন করার জন্য কেবল তুমি অবতীর্ণ হও নররূপে যাকে আমরা অবতার বলি।

ঠাকুর! ঐ সময় ছাড়া তুমি কি তোমার সৃষ্টির মধ্যে থাকো না? অথচ তুমি ব'লেছো তুমি সব বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে সদাসর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকো।

"পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥" গীঃ ৭/৯

(আমি পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ব্বভূতে প্রাণ বা জীবন, তপস্বীদের তপস্যা।)

তাহলে তোমাকে প্রতি যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'তে হবে কেন? দুই হ'ল—যদি তুমি অবতীর্ণ হও তাহ'লে এ জগতের কোথাও না কোথাও তোমাকে অবতীর্ণ হ'তে হবে। তাহ'লেই তো তোমাকে একদেশী ক'রে তুলে তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের ক্ষমতার খর্ব্ব করে নাকি? অথচ তুমি নিজেই ব'লেছ তুমি ব্যাপক।

তিন হ'ল – কর্ম্মফলের পাপ-পুণ্য হিসাবে প্রারব্ধ কর্ম্ম ফলভোগের জন্যই মানুষের এ জগতে হয় জন্ম। তুমি তোমার কোন্ পাপের-ফল ভোগ ক'রতে এ জগতে জন্ম গ্রহণ ক'রবে? অথচ শাস্ত্র বার বার ব'লছে—তুমি নির্ম্মল, তুমি নিষ্কলঙ্ক, তুমি নিষ্পাপ। আমার এ তন্দ্রাচ্ছন্ন বোধে তোমার কথা বুঝতে পারছি না -একটু কৃপা ক'রে

সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে বলতো শুনি। তুমি ভাবছ ছেলেটা খুব ডেঁফো আছে, আমার সব কথারই মধ্যে তর্ক বাধিয়ে বসে। ঠাকুর! তুমি নিজেই ব'লেছ—সব জিনিষকে নেড়ে, চেড়ে, কেটে, কুটে দেখে চিনে নেওয়ার জন্য ব্যাস-চেতনা তথা বিভক্ততার প্রয়োজন; তাই আমার এ প্রশ্ন তোমার কাছে। আসলে কি জান। ঠিক ঠিক স্বাদ পাই না ব'লেই আমরা এত গাই গুঁই করি। মৌমাছি ততক্ষণ গুণ গুণ ক'রে এ ফুল থেকে ও ফুলে উড়ে বেড়ায় যতক্ষণ না মধু পায়। যখন মধু পায় তখন গুণ গুণ ছেড়ে মধু খেতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে।'

শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন—"চুরি, ডাকাতি, খুন, জালিয়াতি প্রভৃতি অপরাধের জন্য অপরাধীদের জেলখানায় পাঠান হয়। ব'লতে পার 'জেলার' তার কোন অপরাধে জেলখানায় থাকে?"

'ও বুঝেছি, বুঝেছি! জেলার সাহেব জেলে থাকে অপরাধীদের জেল-খাটানর জন্য মাত্র; তার কোন পাপ নেই। তুমিও অবতার হ'য়ে অবতীর্ণ হও কেবলমাত্র আমাদের কর্ম্মফল বিধানের জন্য।

তোমাকে তাহ'লে অবতার বলা হয় তোমার অবতরণের জন্য নয়, অর্থাৎ অবতরনাৎ অবতার নয় অবতারনাৎ অবতার। অর্থাৎ জীবের উদ্ধারের জন্য। এই জন্যই তুমি বলেছো 'স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম।' ও 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম'। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিক এই দুই প্রকারে এ জগতে জন্মলাভ হয়। সাধারণ মানুষের যে জন্ম তা লৌকিক বা প্রাকৃত জন্ম। আর তোমার জন্ম অলৌকিক বা অপ্রাকৃত তথা দিব্য। প্রকৃতির বশীভূত হ'য়ে প্রকৃতি দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে মায়াবদ্ধ আত্মবিস্মৃত জীব যে কর্ম্ম ক'রে থাকে; তার ফলস্বরূপ কর্ম্মফলভোগের জন্য শস্যকণা যোগে কর্ম্মফলে নির্দ্ধারিত পিতৃশরীরে পিতার শুক্রকণার সঙ্গে মিলিত হয়। পরে মাতৃগর্ভে পতিত হ'য়ে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে এ জগতে ভূমিষ্ঠ হয় তথা জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু তুমি প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগের জন্য শস্যকণা

গ্রহণের মধ্য দিয়ে পিতৃদেহের শুক্রের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে মাতৃগর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হও নাই ; তোমার জন্ম অপ্রাকৃত বা অলৌকিক। জীবের দেহ ও দেহী অভিন্ন বস্তু নয়। তোমার দেহ ও দেহী দু-ই—একই অভিন্ন। তুমি জন্ম-মৃত্যু রহিত পরমাত্মা হ'য়েও শ্রীঅর্জ্জুনকে তোমার এ জগতে আবির্ভাবের কথা বলেছো—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" গীঃ ৪/৬

(জন্মরহিত অনশ্বর-স্বভাব ও প্রাণীদের ঈশ্বর হ'য়েও আমি স্বপ্রকৃতি আশ্রয় ক'রে নিজমায়া বলে অবতীর্ণ হই।)

সম্ভূতিই তোমার ব্যক্ত অবস্থা। তোমার প্রকৃতি হ'ল অনির্বচনীয়া মায়া। মায়া দ্বিবিধা তাও তুমি ব'লেছো অর্জ্জুনকেই :—

'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ গীঃ ৭/৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ গীঃ ৭/৫

(ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহংকার আমার আট প্রকার ঐশী মায়াশক্তি।

এ নিকৃষ্টা মায়াশক্তি ছাড়াও আমার আর এক প্রকৃষ্টা মায়াশক্তি আছে, যাকে জীবভূতা প্রকৃতি বলে। তার দ্বারাই এই জগৎ ধৃতা।)

তোমার নিকৃষ্টমায়া আট আর প্রকৃষ্টমায়া এক নিয়ে তুমি ৮+১=৯, 'নবরূপ'। নয় সংখ্যা ব্রহ্ম বাচক। কারণ সংখ্যা (নয়) ৯কে যে কোন ভাবে যোগ, বিয়োগ কিংবা গুণ করলে তার ফল এসে এসে দাঁড়াবে নয়ই (৯), অপরিণামী নয় (৯) হ'য়েই। অপরিণামী '৯' পরমব্রহ্মের দ্যোতক ব'লেই এ দেহের দ্বার হয়েছে নটি, রস নটি, ভক্তিও নবধা, যজ্ঞ-উপবীতের সূত্রও নটি, ৯-টি ব্রহ্ম-কর্ম্মের কথাও বলা হ'য়েছে শ্রীগীতায়। মহামতি ব্যাস গীতা সমাপ্ত

করেছেন ১৮টি অধ্যায়ে। ঐ ১৮=১+৮ এর যোগফলও হয় '৯'। ভগবান তথা তুমি এক অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম, খেলা তোমার আট (৮)কে নিয়েই এ জগৎলীলায়। তাই তোমার বাল্যলীলায় তোমার সাথী ছিল অষ্ট প্রধান গোপী – রাধা, হরিপ্রিয়া, শ্রীমতী, পদ্মা, ললিতা, বিমলা, সুকেশী ও সচলা। যার থেকে তোমার অষ্ট অক্ষরে চার নাম— 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' নাম ক'রে বৃন্দাবনে বৃন্দাবতী নিত্য সেবা করতেন। এই অষ্ট অক্ষর চারটি তত্ত্ববীজকেও বুঝায়।

তোমার নিকৃষ্ট মায়ায় পরা-পশ্যন্তি-মধ্যমা ও বৈখরী আবরণেই মানুষের মধ্যে আসে ভেদাভেদ জ্ঞান যা তুমি মানুষের সুকৃতির ফলে হরণ ক'রে না নিলে মানুষের সাধ্য নেই সে আবরণ উন্মোচন করার। তাই কি তুমি বৃন্দাবনে প্রত্যুষে যমুনাতীরে নানান উপাচারে গোপীদের অভিষ্টদাত্রী দেবী কাত্যায়নীর পুজা সমাপনান্তে দেহবস্ত্র পরিত্যক্ত যমুনার জলে স্নানরতা রাধা, বৃন্দাবতী, বিশাখা, ললিতাদের রক্ষিত পরিধান বস্ত্র হরণ ক'রে কদম গাছে গিয়ে ব'সেছিলে ?

এ জগতে জন্মগ্রহণ ক'রে জাগতিক জ্ঞান লাভের সাথে সাথেই মানুষের উপর আসে পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরীর আবরণের প্রভাব তোমার সৃষ্টিমায়ায় দৈহিক ও মানসিক দুই ভাবেই। পুরুষ ও প্রকৃতির লিঙ্গ-ভেদই দৈহিক আবরণের মূল কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। এই লিঙ্গভেদ জ্ঞান থেকেই মনে লজ্জার হয় উদয় ; এই লজ্জা থেকেই জন্ম নেয় লোকভয় ও ঘৃণা। চলতি প্রবাদে বলে —"লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়" অর্থাৎ মনের মধ্যে লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় এই তিনটি মানসিক আবরণ থাকলে মানুষ কখনও পূর্ণভাবে ভগবানকে আস্বাদন ক'রতে পারে না। তোমার অশেষ কৃপাবলে তুমি তথা ভগবান নিজে এই আবরণগুলি হরণ ক'রে না নিলে মানুষ এর থেকে কিছুতেই রেহাই পায় না।

আবরণ বলতে আমরা কি বুঝি ? যা দিয়ে আবৃত করা যায়

তাকেই আবরণ বলে। এখানে বস্ত্র দৈহিক আবরণ ও জল মানসিক আবরণরূপে প্রদর্শিত হ'য়েছে। যমুনার জলে স্নানরতা গোপীনীরা যখন দেখলেন বা জানলেন কৃষ্ণ তাদের পরিধান বস্ত্র তথা দেহাবরণ হরণ ক'রেছেন তখন পরিধান বস্ত্র তথা দেহাবরণ ফিরে পাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন বার বার তোমার কাছে—

"মহা নয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বস্তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জ্ঞানীমোহঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥
শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নো চেদ্রাজ্ঞে ব্রুবামহে॥"
একি রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ, শীতে অঙ্গ কাঁপে,
বাড়বে বেলা, লোকের মেলা, মরব মনস্তাপে।
সত্যি কালা নও-'ত' কালা মিছে কেন বাড়াও জ্বালা,
কুলবালা, দাও হে বসন ফেলে।

তাদের এই বস্ত্র ফেরত দেওয়ার অনুরোধে, তুমি তাদের জল থেকে বিবসনে উঠে এসে বস্ত্র ফেরত নিতে বলেছিলে। ব'লেছিলে তারা যদি তোমারই হয় তাহ'লে তোমার কথা অনুসারে যেন তারা তোমার কাছ থেকে বস্ত্র নিয়ে যায়। অন্যথা তুমি বস্ত্র কিছুতেই দেবেনা ফেরত।—

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্তু শুচিস্মিতাঃ॥

দৈহিক আবরণ রূপ বস্ত্র তথা ভেদ জ্ঞান তোমার দ্বারা হৃত হ'য়ে তাদের দৈহিক আবরণ গেলেও, তারা মানসিক আবরণ রূপ জলকে আশ্রয় ক'রে তাদের লজ্জা নিবারণের জন্যে জলের মধ্যেই ক'রছিল অবস্থান।

ক্রমে তারা যমুনার জলের মধ্যেই তোমাকে দেখতে পেয়েছিল— দেখতে পেয়েছিল তাদের নিজেদের মধ্যেও। অন্তর ও বাহির তাদের

সর্ব্বত্র যখন তুমি তথা কৃষ্ণময় হ'য়ে উঠেছিল তখন তাদের সব লজ্জা ও লোকভয় কি আর থাকে? লজ্জা ও লোকভয় হয় দূরীভূত; কারণ নিজেকে দেখে কেউ লজ্জা আর ভয় পায় কি? তারা যে তুমি তথা কৃষ্ণময় হ'য়েছিল ব'লেই বিবস্ত্রে জল থেকে উঠে এসেছিল তোমার কাছে। তখন তুমি গোপীদের ব'লেছিলে,—'তোমরা সিদ্ধ হ'য়েছ, এখন ব্রজে যাও ফিরে। আগামী রজনী সমূহে তোমরা আমার সঙ্গে ক্রীড়া করতে পারবে'—ব'লে দিয়েছিলে প্রতিশ্রুতি।—

'যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুবার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥

গোপীরা সাধারণ রমণী নয়—কেহ ঋষিচরী, কেহ শ্রুতিচরী, কেহ দেবকন্যা, কেহ গোপকন্যা। গোকুলে জন্মগ্রহণ ক'রলেই সকলে অপ্রপঞ্চ দেহধারী গোপী হন না। গোকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেও ঋষিচরী গোপীরা সাধন ক'রে সিদ্ধ হননি, তারাই স্বামী সেবায় গৃহের ভিতরে অবরুদ্ধ হ'য়ে অবস্থান ক'রেছিলেন। আর সিদ্ধ গোপীরা অবাধে তোমার তথা কৃষ্ণ সঙ্গে মিলনের পেয়েছিলেন সুযোগ। তাই পদ্ম পুরাণ গোপীদের শ্রেণী ভাগ ক'রে ব'লেছে—

'গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যা কাঃ
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চন॥'

আচ্ছা প্রভু! শ্রীগুরু মুখে শুনেছি ত্রেতাযুগে পিতৃসত্য পালনের জন্য দণ্ডকারণ্যে বসবাস কালে বিষ্ণুর সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা শ্রীরামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে প্রেয়সীভাবে ভজনের অভিলাষ ক'রেছিলেন।

'পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্।'

বিষ্ণুর সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্র এক পত্নী ব্রতধারী ছিলেন ব'লে ত্রেতায় সেটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তিনি দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে তাদের

অভিলাষ পূর্ণ ক'রবেন ব'লে ব'লেছিলেন। এরাই হ'লেন সাধনসিদ্ধ গোপী। দ্বাপরে তোমাকে প্রাপ্তির ফলে সংসার বন্ধন থেকে হয়েছিলেন মুক্ত।

'তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্না সমুদ্‌ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সম্প্রাপ্য কামনে ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥'

নিত্যসিদ্ধা গোপীরা তোমার সঙ্গে আরাধিত হন ব'লেই তুমি গোপীবল্লভ স্বরূপ। তাই শুনে পদকর্ত্তা গেয়ে উঠেছিলেন—

রূপে ভ'রল দিঠি সৌরিপরশ মিঠি
পুলক না তেজি অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপুরিত
না শুনে আপন-পর সঙ্গ।
সজনি অব কি করিবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনুমন বাতুল
না সহে ধরম-ভয়-লেশ।

তুমি গোপীদের অঙ্গ-বস্ত্র হরণের মধ্য দিয়ে পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী আবরণ হরণ ক'রে তোমাকে পূর্ণভাবে আস্বাদন ক'রতে দিয়েছিলে ব'লেই তারা ক্রমে ব্রজমধ্যে তুমি তথা কৃষ্ণ ছাড়া অন্যরূপ দর্শন ক'রতে, কৃষ্ণ মুরলী ধ্বনি ছাড়া অন্য কিছু শুনতে পেতেন না। তাদের নাসিকাও অনুভব ক'রতে পারত না তোমার সৌরভ ছাড়া অন্য কোন গন্ধ। কৃষ্ণপ্রেম-সাগরে এমনভাবে তারা নিমজ্জিত হ'য়েছিল যে তোমার তথা কৃষ্ণতত্ত্ব ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাদের এ ভাবনায় ভাবিত হ'য়ে পদকর্ত্তার কণ্ঠে উদ্গীথ হ'ল—

বধূ হে! আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থোব॥

ভেদাভেদজ্ঞান রহিত ক'রে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্যে দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্রকে দিতে হয়েছিল সমস্ত রাজ্য রাজকোষ ও বিক্রয় ক'রতে হ'য়েছিল স্ত্রী শৈব্যা ও নিজেকে ঋষি বিশ্বামিত্রকে দান-দক্ষিণা দেওয়ার জন্য। তাকে এই ভেদ-রহিত জ্ঞান শিক্ষা দিতে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ চণ্ডাল-বেশে ক্রয় ক'রে মৃতের দাহকর্ম্মে ক'রেছিলেন নিযুক্ত। ভাগ্যের পরিহাসে রাজ্য পরিচালনা থেকে রাজা হরিশ্চন্দ্র হ'লেন মৃতের দাহকর্ম্ম পরিচালক। বহুদিন এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর কাজের ফাঁকে চণ্ডালরূপী ধর্ম্মরাজ রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কতকগুলি মাথার খুলি দেখিয়ে বলেছিলেন, "দেখ-ত, এই মাথার খুলিগুলির মধ্যে কোনটা ব্রাহ্মণের, কোনটা ক্ষত্রিয়ের, কোনটাই বা বৈশ্যের ?"

রাজা হরিশ্চন্দ্র অনেকক্ষণ ভাল ক'রে নেড়ে দেখে-নিয়ে বলে-ছিলেন, "সবই সমান মনে হ'চ্ছে।"

চণ্ডালরূপী ধর্ম্মরাজ বলেছিলেন—ঠিকই ব'লেছ তুমি, সবই সমান ; এই হ'ল আসল জ্ঞান—এই হ'ল ভেদরহিত জ্ঞান।"

তারপর থেকেই তার পরীক্ষার হ'য়েছিল সমাপ্তি। তাকে স্বরূপে দর্শন দিয়ে ধর্ম্মরাজ তাঁর পূর্ণপ্রাপ্তির পথ ক'রেছিলেন প্রশস্ত।

প্রভু! তুমি নাকি বৃন্দাবনে গো ও গোপ বালকদের মঙ্গলের জন্য কালীয়নাগকে দমন ক'রেছিলে ?

নাগবৃত্তি হ'ল সদাসর্ব্বদা অন্যের ক্ষতি করার প্রবল বাসনা বা ইচ্ছা। সেই নাগবৃত্তির জন্যেই কালীয় নাগ কি অবোধ পশু, বালক বা মানুষ—সবাইকে হিংসা, উৎপীড়ন করত দেখে তুমি কালীয়নাগের মাথায় চড়ে নৃত্য ক'রতে ক'রতে তাকে দমন ক'রেছিলে বৃন্দাবনে ? প্রভু! মানুষের মধ্যে পরহিংসা ও অপরকে উৎপীড়ন করার ইচ্ছারূপ যে নাগবৃত্তি সদাসর্ব্বদা বর্তমান, সেই প্রবৃত্তির উপর দাঁড়িয়ে যদি তুমি নৃত্য কর তাহলে মানুষের ঐ হিংসা, দ্বেষ, পরউৎপীড়ন বৃত্তির ঘটবে নিবৃত্তি।

'আচ্ছা প্রভু! তোমার পদলাভের জন্য সাধককে দান, ধ্যান, ব্রতপালন, বেদপাঠাভ্যাস, তপস্যা, যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে সব সময় তা করা সম্ভব হ'য়ে উঠে না। ঐ ক্রিয়াদি ছাড়া কি অন্য কোন পথ অবলম্বন ক'রে সহজে তোমার পদ-লাভ করা যায়?'—প্রশ্ন ক'রলাম আমি।

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন,—"এ ব্যাপারে আমি উদ্ধবকে বলেছিলাম—

'ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥
সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃ প্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥
কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥
যং ন যোগেন সাঙ্খ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি॥

রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে শ্বাফল্কিনা মযানুরক্তচিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগতীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥
তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবৎ তাঃ পুণরঙ্গ তাসাং হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥
তা নাবিদণ মযানুষঙ্গবদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥
মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥
তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত

যম, নিয়ম, দান, ধ্যান, তীর্থপর্য্যটন, সাঙ্খ্য, যোগ, বেদ-অধ্যয়ণ, তপস্যা প্রভৃতির অনুষ্ঠানের চেয়েও আমি সব আসক্তিশূন্য সৎ-সঙ্গে অনেক বেশী আকৃষ্ট হই। রাক্ষস, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, মৃগ, পক্ষী, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজ সকল মানুষ যুগে যুগে আমার পদপ্রাপ্ত হয়েছিল; বৃত্তাসুর, প্রহ্লাদ, বিশপর্বা, বলি, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জম্ববান, জটায়ু, গজেন্দ্র, তুলাধার, ধর্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীরা ও অপর সকলে সৎসঙ্গ বলে আমার পদলাভ ক'রেছিল।

তারা বেদপাঠ করেনি, করেনি পরমপুরুষের উপাসনা। তারা তপস্যা না ক'রেও কেবল আমার ও আমার ভক্তদের সঙ্গ করায় তারা আমাকে প্রাপ্ত হ'য়েছিল। ব্রজের সকল গোপীরা, যমালার্জ্জু-নাদি সকল বৃক্ষ, মৃগ, মূঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন কালিয়াদি নাগেরা ও অন্যান্য

মূঢ়বুদ্ধি লোকেরা প্রীতির দ্বারাই সহজে সিদ্ধিলাভ ক'রে আমাকে প্রাপ্ত হ'য়েছিল।

দান, গুণকীর্ত্তন, সাঙ্খ্য, যোগ, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদপাঠ, ব্রত উদ্‌যাপন ও সন্ন্যাস দ্বারা যত্নবান মানুষও আমাকে লাভ ক'রতে সক্ষম হয় না।

শ্রীবলরাম ও আমি যখন অক্রুর-সঙ্গে বৃন্দাবন থেকে মথুরা যাচ্ছিলাম; তখন আমাতে অনুরক্ত-চিত্ত গোপীরা আমার বিচ্ছেদে, দুঃখে কাতর হ'য়ে আমার প্রতি গাঢ় প্রেম বশতঃ অন্য কোন বস্তু সুখের নিমিত্ত দর্শন করেনি।

হে উদ্ধব! তাদের প্রিয়তম হ'য়ে বৃন্দাবনে রাত্রিকালে তাদের অল্পসময়ের জন্য আমার সঙ্গলাভ হ'য়েছিল, পরে আমাকে না পেয়ে তাদের সব রাত্রি কল্পসম বোধ হ'য়েছিল।

সমাধি অবস্থায় মুনিরা যেমন-নাম বা রূপ কিছুই মনে রাখেন না, সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট নদীগুলির মত আমাতে-প্রবিষ্ট ও আমাতে অনুরক্ত-চিত্ত সকল গোপীরা তাদের দেহাদি, পতি, পুত্র, মমতা, সম্পদ, ইহলোক, পরলোক কিছুই জানতে পারেনি।

আমাকে যারা পেতে চাইতো, তারা কিন্তু আমার স্বরূপ, নিজেদের সৌন্দর্য্যাদি না জেনে তারা কেবল রমণ-বিষয়ক জার ব'লেই আমাকে জানতো, তা সত্ত্বেও আমার সঙ্গলাভে পরমব্রহ্মরূপ আমাকে প্রাপ্ত হ'য়েছিল।

অতএব উদ্ধব! তুমি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, শ্রোতব্য ও শ্রুতবিষয় পরিহার ক'রে সর্ব্বপ্রযত্নে সকল দেহীর আত্মারূপ আমার শরণাপন্ন হও। তাহ'লে আমার দ্বারা তুমি অকুতোভয় অর্থাৎ ভয়শূন্য হবে।'

তা শুনে উদ্ধব ব'লেছিল—

'সংশয় শৃণ্বতো তৎ যোগেশ্বরেশ্বর।
ন বিবর্ত্তত আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ।'

(হে যোগেশ্বর ! আপনার কথা শুনে আমার অন্তরের সংশয় দূর হচ্ছে না। যার ফলে আমার মন ভ্রাম্যমাণ হচ্ছে।)

তখন আমি পুনরায় তাকে ব'লেছিলাম—

স এস জীবো বিবরপ্রসূতি প্রাণেনঃ ঘেষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমূপেত্য রূপং মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্টঃ ॥
যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা বলেন দারুণ্যধিমথ্যমানঃ।
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমিধ্যতে তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী॥
এবং গদিঃ কর্ম্ম গতির্বিসর্গো ঘ্রাণো রসো দৃক্ স্পর্শঃ শ্রুতিশ্চ।
সঙ্কল্পবিজ্ঞানমথাভিমানঃ সূত্রং রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ ॥
অয়ং হি জীবস্ত্রিবৃদব্জযোনিরব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ।
বিশ্লিষ্টশক্তির্বহুধেব ভাতি বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ ॥
যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ।
য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে ॥
দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ ॥
অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥
এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেন শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত

(হে উদ্ধব ! নাদযুক্ত প্রাণ মনঃ সহ আধারাদি চক্রে প্রবিষ্ট ছয় চক্রে অভিব্যক্ত সেই পরমেশ্বর মণিপুর ও বিশুদ্ধচক্রে মনোময় সূক্ষ্ম রূপ ধারণ ক'রে মুখবিবরে হ্রস্বাদি মাত্রা, উদাত্তাদি স্বর ও আকারাদি ভাবে স্থূলভাবে প্রকাশিত হন।

আকাশে উষ্মরূপে ব্যক্ত অগ্নি যেমন—কাঠে অধিকরূপে মথিত হ'লে বায়ুযোগে প্রথমে সূক্ষ্ম বিস্ফূলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হ'য়ে ঘৃত দ্বারা ক্রমে

বেড়ে যায়, সেই রকম এই বাক্য তথা বেদরূপ বাণী আমারই প্রকাশ ব'লে জ্ঞাত হবে।

প্রথমে ঈশ্বর অব্যক্ত তথা একাই মাত্র ছিলেন। ক্রমে বাগাদি ইন্দ্রিয়রূপ শক্তি বিভক্ত হ'য়ে মায়াশক্তির প্রভাবে বহুভাবে প্রতিভাত হয়েছেন। তিনিই আদি ত্রিগুণাশ্রয়, লোক পদ্মের কারণভূত, যেমন-ক্ষেত্রে পতিত হ'য়ে বীজ সকল বহু আকার ধারণ করে। উপাদান ও কারণ দীর্ঘ ও বক্র সূতো যেমন-বস্ত্রে ওৎপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ ঈশ্বর ঐ জগতের মধ্যে ওৎপ্রোতভাবে ব্যপ্ত আছেন। পুরাণে বর্ণিত অনাদি প্রবৃত্তি স্বভাবরূপ বৃক্ষ—ভোগ ও মোক্ষ দুই পুষ্প ও ফল প্রসব করে।

পাপ-পুণ্যরূপ দুটি ইহার বীজ ; অপূরিত বাসনা ইহার মূল, সত্ত্ব-রজঃ ও তমঃ তিন গুণ ইহার কাণ্ড, পঞ্চভূত ইহার স্কন্ধ ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি বিষয়ের প্রসূতি, একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার শাখা। বীজ ও পরমাত্মা দুটি হ'ল এই বৃক্ষের দুই পাখী। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই বৃক্ষের ছাল, সুখ ও দুঃখ এই বৃক্ষের ফল। এই বৃক্ষরূপ দেহ সূর্যমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হ'য়ে বর্তমান আছে।

কামীগৃহস্থরা এই বৃক্ষের ফল ভোজন করে, অরণ্যবাসী বিবেকীরা সুখরূপ আর একটি ফল ভোগ করে। এই সকল বিষয় যিনি পূজ্যপাদ শ্রীগুরুর সাহায্যে জানেন, তিনিই বেদের তত্ত্বার্থ জানতে পারেন।

অতএব হে উদ্ধব! তুমি গুরুপাসনা জনিত একান্ত ভক্তি ও সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান কুঠার দিয়ে অপ্রমত্ত হৃদয়ে জীবোপাধি লিঙ্গ-শরীর ছেদন ক'রে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হ'য়ে পরে ঐ অস্ত্র ত্যাগ ক'রবে।

সৎ-সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ-সঙ্গে সর্ব্বনাশ।'—এটা মর্ত্ত্যের এক গুণী-জনেরই বাক্য।'

'আচ্ছা প্রভু! তোমার পদলাভের পর কিংবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের

পর, কোনরূপে মোহগ্রস্ত হ'য়ে মানুষের মধ্যে কি আবার অজ্ঞান জন্মে ?'—প্রশ্ন করলাম আমি।

উত্তরে ভগবান ব'ললেন,—'একবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লে মানুষ আর মোহগ্রস্ত হয় না এবং পুনরায় তার মধ্যে অজ্ঞান জন্মাতে পারে না, তাই আমি অর্জ্জুনকে ব'লেছিলাম—

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ গীঃ ৪/৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ গীঃ ৪/৩৬

(হে পাণ্ডব ! আমাহ'তে লব্ধ জ্ঞান তথা উপদিষ্ট জ্ঞানলাভে তুমি কখনও মোহগ্রস্ত হবে না ; কারণ একবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লে পুনরায় আর অজ্ঞান জন্মায় না। সেই জ্ঞান বলে তুমি ব্রহ্ম থেকে স্থাবর পর্য্যন্ত সব ভূতকে নিজের আত্মাতে দেখতে পাবে। সব পাপী থেকে তোমার পাপ বেশী হ'লেও ঐ জ্ঞান-পোতের সাহায্যে ধর্মাধর্ম-রূপ সংসার সাগর থেকে তুমি উত্তীর্ণ হবে।)'

'কি ক'রে এই জ্ঞান লাভ হয় প্রভু ?'

হাস্য-বদনে তিনি ব'ললেন,—'আমি অর্জ্জুনকে ব'লেছিলাম—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ গীঃ ৪/৩৪

(ভক্তিনম্র প্রণিপাতে, শ্রদ্ধাসহকারে জিজ্ঞাসা ও গুরুসেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমাকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান ক'রবেন।)'

হরণ-বস্ত্র গোপীদের প্রদানকালে, তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে শরৎ-পূর্ণিমার রাত্রে বনস্থলীর শোভায় আবিষ্ট হ'য়ে তুমি যমুনার তীরে রাসৌলি গ্রামের বনপ্রান্তে গোপীদের আহ্বান ক'রে মনোমোহিনী বাঁশী বাজিয়েছিলে।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎকোমলগোভি রঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥

সেই অনির্বচনীয় বাঁশীর সুর তারাই বুঝেছিল, তুমি যাদের উদ্দেশ্যে বাজিয়েছিলে সে মোহিনী বাঁশী। ব্রজললনারা ঐ রাত্রিকালে কেউ পুত্রকে বক্ষদুগ্ধ প্রদানে, গোসেবায়, পতিসেবায় কিংবা রন্ধনে ছিল ব্যস্ত; তোমার মোহিনী বাঁশী শুনে আকৃষ্ট হ'য়ে কোন হিতাহিত বিচার, গৃহকর্ম্ম, লজ্জা, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার, বেশভূষার চর্চা না ক'রেই তোমার সঙ্গলাভের জন্য তোমার বাঁশীর সুর লক্ষ্য ক'রে উন্মত্তের মত গিয়েছিল ছুটে। কারুর উপদেশ নেওয়ার সময় ছিল না, সময় ছিল না ক্রন্দনরত ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকে স্তন দেওয়ার; সময় ছিল না উনুন থেকে রান্নার হাড়ি-কড়া নামাবার, সময় নেই পতিসেবা বা গুরু-জনদের শুশ্রূষার—তারা কেউ কাউকে সঙ্গে না নিয়েই ছুটে চ'লেছিল শ্যাম দরশনে। বিভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন গুণের অধিকারিণী হ'য়েও গোপীদের নিজ নিজ প্রকৃতির এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিল তাদের মধ্যে তোমার বাঁশীর মোহিনী সুর। সেই মোহিনী বাঁশীর সুর, তোমাকে দেখার লালসাকে ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর ক'রে তুলেছিল গোপীদের। যার ফলে এত আনমনা হ'য়ে পড়েছিল তারা যে—'কি করিতে কি না করে, সকলই হইল ভুল।' তারা তাদের সাজসজ্জা ছেড়ে, পিতামাতা, ভ্রাতা, পতির বারণ না শুনে সব কর্ম্ম ছেড়েই ছুটেছিল তোমাসাথে মিলনের ইচ্ছায়।

দুহন্ত্যোহভি যযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চলোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥
তা বার্য্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত।

আবার যে সব গোপীরা তাদের পতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হ'য়ে ঘরে র'য়ে গেল, তোমার কাছে যেতে না পেয়ে, তোমার ভাবনায় নিয়ত থেকে মিলিত নয়নে তোমাকে ধ্যান করার ফলে তাদের পাপ বিনষ্ট হ'য়ে ধ্যানযোগে তোমার আলিঙ্গন পেয়ে পরমসুখ ভোগ ক'রেছিল।

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত।

সব ফেলে উন্মাদিনীর মত ছুটে তোমার কাছে যে সব গোপীরা এসেছিল তোমার সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে, তাদের মনের অবস্থা, তাদের স্বভাব, তাদের ইচ্ছা জানা সত্ত্বেও তুমি ব্রজসুন্দরী গোপীদের নিজমুখে নির্লজ্জভাবে কৃষ্ণপ্রেমের কথা তথা তোমাকে প্রাণাধিক ভালবাসে, তাদের মুখে এ কথা শুনবার জন্যই ছল্ ক'রে গোপীদের কুশলবার্তা এবং তাদের তোমার কাছে আসার কারণ প্রভৃতি জিজ্ঞাসা ক'রে ব'লেছিলে,—ঘোর রজনীতে বাঘ-ভল্লুক প্রভৃতি

ভয়ঙ্কর পশু-উপদ্রাবিত এই বনে রমণীদের থাকা উচিত নয়, শীঘ্র ব্রজে ফিরে যাওয়ার কথা। গোপীদের পিতা-মাতা, ভাই, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবরা গৃহে তাদের দেখতে না পেয়ে ইতস্ততঃ অন্বেষণ ক'রতে ক'রতে এখানে এসে তোমার কাছে গোপীদের দেখলে তা তোমার ও গোপীদের লজ্জা ও ভয়ের কারণ ঘটবে। বলেছিলে, এখানে দেরী না ক'রে ব্রজে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ পতিদের সেবা ক'রতে ও গৃহে ক্রন্দনরত বৎস ও বালকদের, দুগ্ধ দোহন ক'রে, দুগ্ধ পান করাতে।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্‌ব্রূতাগমনকারণম্‌॥
রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥
মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মাকৃঢ়্‌ং বন্ধুসাধ্বসম্‌॥
তদ্‌যাত মাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্‌ সতীঃ।
ক্রন্দান্তি বৎসা বালাশ্চ তান্‌ পায়য়ত দুহ্যত॥

—শ্রীমদ্ভাগবত।

তুমি পতিসেবা, গুরুজনদের শুশ্রূষা, পুত্রদের প্রতিপালন, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতির কথা উল্লেখ ক'রে গোপীদেরকে সতীধর্ম্ম, সংসারধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যের নানান উপদেশ শুনিয়ে ব্রজে যেতে উপদেশ দিয়েছিলে, তাতে গোপীমনে প্রশ্ন জেগেছিল— এ উপদেশ কি (১) তোমার গোপীদের প্রতি উপেক্ষা? (২) না—তোমার তাদের সঙ্গবিহারের লালসা? (৩) না—তোমার প্রতি গোপীদের ভালোবাসার কথা গোপীমুখ থেকে শুনার ইচ্ছা কিংবা গোপীদের প্রেমের উৎকণ্ঠা ও ঐশ্বর্য পরীক্ষা?

তোমার উপদেশবাক্যেও যখন তারা গেল না ব্রজে ফিরে,

তোমার জন্য তারা তাদের আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, পিতা, পুত্র, পতি, সংসার বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিতা নয়, তখন তুমি মায়াগোপী সৃষ্টি ক'রে, যে সব গোপীরা তোমার কাছে অবস্থান করছিল তাদের গৃহে পাঠিয়ে দিয়েছিলে। গোপীরূপী কৃষ্ণকে পেয়ে গোপেরা পরিতুষ্ট ছিল, তারা তোমার প্রতি কোন আক্রোষ পোষণ করেনি তাই। গোপীরা ব'লেছিল তোমাকে—

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্বঃ আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর ! মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র।
তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দিন ! তেঽঙ্ঘ্রি মূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম—
তপ্তাত্মনং পুরুষভূষণ ! দেহি দাস্যম ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ।

(হে আত্মণ ! জ্ঞানীজন নিত্যপ্রিয় তোমাকেই রতি ক'রে থাকেন। পতি-পুত্র কেবল পীড়াদায়ক, তার প্রয়োজন নেই। হে বরদ ! হে ঈশ্বর ! হে বরদেশ্বর ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও ; আমরা তোমার ভক্ত। আমাদের আশাভঙ্গ ক'রো না।)

হে দুঃখহারী ! তোমাকে ভজনের আশা ক'রেই সমস্ত আত্মীয় পরিজন, পরিচ্ছদ, গৃহ প্রভৃতি সব কিছুই ত্যাগ ক'রে তোমার পদ-মূলপ্রান্তে এসেছি। হে পুরুষরত্ন ! তোমার সুমধুর হাস্যরসে আমাদের দেহ-মন অভিতপ্ত। দয়া ক'রে আমাদের পরিত্যাগ না করে তুমি তোমার সেবিকা ক'রে নাও।

তখন তুমি বলেছিলে—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ।
যা মাভজন দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

—শ্রীমদ্ভাগবত

(আমার জন্য তোমরা সংসার-মায়া ছিন্ন ক'রে এসেছ, কিন্তু ব্রহ্মার আয়ু লাভ ক'রেও ঐ কাজের প্রতিদান দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাদের নিজগুণে ক্ষমাই আমাকে এর থেকে মুক্ত ক'রবে।) এই বাক্যদ্বারা তুমি কামিনীদের কামী হ'তে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলে।

এ জগতে নারীপুরুষের মধ্যে সহজাত প্রকৃতির নিয়মেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ থাকে, যার পেছনে র'য়েছে আনন্দোৎপাদিকা শক্তির প্রভাব। যা থেকে এ জগতে সৃষ্টি ও প্রজননের কাজ চলমান র'য়েছে। ঐ আনন্দোৎপাদিকাশক্তির মূলে কিন্তু র'য়েছে কাম।

তুমি অর্জ্জুনকে বলেছিলে—তুমিই কাম রাগবর্জ্জিত বল এবং সকলপ্রাণীর ধর্মবিরুদ্ধ কামও।

'বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥' গীঃ ৭/১১

আরও ব'লেছিলে তুমিই লোকসৃষ্টিকারী কাম।

'প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ'

তাই হিন্দুবিবাহের মন্ত্রে রয়েছে—'কামোদাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা'

ক্ষণিক আনন্দ দিয়ে কাম মানুষকে নিয়ে যায় উৎশৃঙ্খলতায় ও কুপথে। তাই তুমি অর্জ্জুনকে বলেছিলে কাম থেকেই লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুর হয় উদ্ভব।

'সঙ্গাৎ সংজাযতে কামঃ, কামাৎ ক্রোধভিজাযতে।' তাই অর্জ্জুনকে এই কামকে জয় করতে বলেছিলে।

'জহি শত্রং মহাবাহো কামরূপং তুরাসদম্।'

তুমি গোপীদের সবাইকে পরশ ও আলিঙ্গন দান ক'রলে তারা দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রস্তাব ও প্রযত্ন ক'রেছিল, কিন্তু আংশিক অঙ্গস্পর্শ ক'রে তাদের অনঙ্গকে শান্ত ক'রে আত্মারাম অখণ্ডিত স্বভাবের পরিচয় দানে গোপীদেব কামোপশমের ব্যবস্থা ক'রে রাস-লীলায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলে। গোপিদের ঈর্ষাপরায়ণ মনোভাব অনুভব ক'রে যত গোপী, তত কৃষ্ণ হ'য়ে প্রত্যেক নৃত্যরতা গোপীর পাশে ও মাঝখানে রাধাসঙ্গে কৃষ্ণ হ'য়ে বিরাজমান ছিলে।* রাসলীলার মধ্যে অনন্ত ঐশ্বর্য্য নিহিত থাকলেও ঐ ঐশ্বর্য্যের দিকে কারুরই লক্ষ্য ছিল না। তোমাকে বর্তুলাকারে সব গোপীরা নৃত্যরতা ছিল। প্রত্যেক গোপীই মনে মনে ভাবছিল কৃষ্ণ কেবল তারই কাছে আছে। তুমি সর্ব্বত্র, তা কারুর লক্ষ্য ছিলনা। লক্ষ্য শুধু নিজের কাছে তথা তোমার প্রতিমূর্ত্তিব দিকে। রাসলীলা ঐশ্বর্য্য ও মাধুরীপুষ্ট, কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্য ও মাধুরীর অন্তরালে আত্মগুপ্ত। প্রত্যেক গোপী নিজে নিজে কেবল তোমাকে পেয়েছে ভেবে তোমার গরবে গরবিনী হ'য়ে প্রত্যেকে একে অপরের চেয়ে সৌভাগ্যবতী ব'লে মনে মনে অনুভব ক'রেছিল।

* টীকা: রাস হ'ল হল্লীসক নৃত্য। বহুজন একত্র হ'য়ে একস্বরে গান ও এক-তালে বর্তুলাকারে নৃত্যের অনুষ্ঠানকে রাসনৃত্য বলে।

এ যেন কবির ভাষায়—'তুমি আর আমি, মাঝখানে কেহ নাই
কোন বাধা নাই ভুবনে।'

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহ্যধিকং ভুবি ॥

তোমাকে নিয়ে পরকীয়া গোপীদের মধ্যে গর্ব অনুভূত হ'লে তুমি তা নিবারণের জন্য সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলে। গোপীদের অন্তর অহংকারের ছায়ায় তোমার তথা কৃষ্ণলীলা বুদ্ধির অবিষয়ীভূত হ'য়ে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা হওয়ায় কৃষ্ণপ্রেম তথা তোমার লীলা আস্বাদন অসম্ভব হ'য়ে পড়েছিল তাদের কাছে। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা হ'ল কাম। কাম জয় না করতে পারলে, নিজ সুখস্পৃহা, নিজের অস্তিত্ব লোপ না পেলে প্রেমরাজ্যে প্রবেশ ঘটে না—কৃষ্ণ-প্রাপ্তিও ঘটে না—ঘটলেও তা হারিয়ে যায়। প্রথমে সতী হ'তে হবে। তারপর ছাড়তে হবে আমি-ভাব। আমার গৃহ, আমার পতি, আমার পুত্র-জ্ঞান পূর্ণভাবে দূর না হ'লে,সতী হ'য়ে নিজপতির মধ্য দিয়ে সেই জগৎপতিকে উপলব্ধি করা সহজ নয় মোটেই। তোমার লীলারসাস্বাদন সেই ক'রতে পারে, তুমি যাকে উপযুক্ত মনে ক'রে তোমার লীলা-রস আস্বাদনে নিমন্ত্রণ কর—বরণ কর।

তাই উপনিষদ বলছে—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।'
তার কাছেই তিনি আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন—

'তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।'

তোমাকে পেতে হ'লে আত্মশক্তি চাই, ধৈর্য্যচাই, অধ্যবসায় চাই, চাই প্রবল উৎকণ্ঠা ও প্রগাঢ় ইচ্ছা আর তোমার কৃপা।

তোমার হঠাৎ অন্তর্ধান,—তুমি তাদের কাছে নেই—অনুভব ক'রে* পরকীয়া গোপীরা পাগলিনীর মত এদিক ওদিক তোমাকে খুঁজতে লাগল ; বৃক্ষ, তরুলতা, পশু-পাখী, মৃগ-মৃগীদের কাছেও তোমার সন্ধান ক'রতে লেগেছিল। তোমার সন্ধান না পেয়ে কেউ মাথায় চূড়া শিখি-পুচ্ছ বেঁধে, বাঁশী নিয়ে বাজাতে লাগল, কেউ শিশু-কৃষ্ণ হয়ে অপর গোপীকে পুতনা ভেবে তার স্তন পান ক'রতে লাগল, কেউ কেউ কৃষ্ণ আর রামের মত ক্রীড়ারতা হয়েছিল তারা কৃষ্ণের বাল্যাদি লীলার অনুকরণ করতে করতে ক্রমে তাদের অহংকার, তাদের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা চলে গিয়ে ভিতর ও বাইরে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাতেই ব্রতী হ'য়ে কৃষ্ণময় হ'য়ে গিয়েছিল, তখন তুমি পুনরায় সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলে। তোমার রাসলীলা শিক্ষা দান করে যে, প্রেম কাম নহে। তাই তুমিই গোপীদের ব'লেছিলে—

ন প্রীতয়েঽনুরাসায় হ্যঙ্গসাঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্সাথ ॥

(এপৃথিবীতে অঙ্গে অঙ্গ মিলনেই যে সুখ বা স্নেহাতিশর্য্যের কার্য্য

টীকা : * পরকীয়া গোপী অর্থে পরস্ত্রী নয়। তারা যে কৃষ্ণকান্তা নয় এমন নয়। এখানে 'পর'-অর্থে পরম তথা পরমেশ্বরের পরমপ্রিয় গোপী হ'লে পরকীয়া গোপী হয়। গর্গসংহিতা ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল। এ বিবাহে ব্রহ্মাই কন্যাদান করেছিলেন হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে।

* মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন শ্রীবংশীবদন গোস্বামীকে—'পর শব্দে শ্রেষ্ঠ কহি দারার্থে প্রকৃতি। / সেই সে প্রকৃতি গোপী শাস্ত্রেতে বিবৃতি ॥ / যিনি আত্মারাম তাঁর পরদারে রতি। / কভু নাহি হয় এই জানিহ সুমতি। / অপরের দারা কভু নহে গোপীগণ ॥'

সাধিত হয় এমন নয়। তোমাদের চিত্ত সর্ব্বদা আমাতেই অর্পিত, অতএব আমাকে প্রাপ্ত হবে এতে কোন সন্দেহের কারণ নেই।) আসলে আমরা ভালবাসতে জানি না। মায়া, মোহ, আসক্তিকেই ভালবাসা ব'লে ভুল ক'রে থাকি। এই মায়া-মোহ বা আসক্তি হ'ল ভালবাসার প্রধান শত্রু। তোমাকে পেতে হ'লে ভগবদ্ভাবের বিরুদ্ধ যা কিছু সব ছাড়তে হবে। সংসারের সঙ্গে তোমার বিরুদ্ধভাবের সঙ্গে সন্ধি ক'রে তোমাকে পেতে চাওয়া চরম মূর্খতা মাত্র। শ্যামকে পেতে হলে কুলধর্ম্ম ত্যাগ ক'রতেই হবে। তুমি বৃন্দাবনের গোপী জন বল্লভ। রাস কেবলমাত্র বৃন্দাবনেই অনুষ্ঠিত হ'য়েছে, অন্য কোন ধামে নয়।

রাস গোপীজন বল্লভের রাস—রাস রাধা বল্লভের রাস। বৃন্দাবন একটা স্থান—চৈতন্যের একটি অবস্থান্তর, বৃন্দাবনে গোপীদের ভাব সিদ্ধাবস্থার। সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধারণ ধর্ম্ম ও সিদ্ধাবস্থার ধর্ম্ম এক হয় না। সাধনাবস্থার সাধক, সিদ্ধাবস্থার ধর্ম্ম, কর্ম্ম ধারণায় আনতে পারবে না—আনা সম্ভবও নয়। তাই গোপী প্রেম বা সাধনা সবার পক্ষে অনুধাবন করা সহজ নয় মোটেই। তোমার নির্দ্দেশে জ্ঞানী উদ্ধব গোপীদের উপদেশ দিতে বৃন্দাবনে এসে গোপীপ্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন ক'রে বৃন্দাবনে বৃক্ষ হ'য়ে জন্ম নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

তুমি অর্জ্জুনকে ব'লেছিলে গোপীরা যে তোমার কি হন, তা তুমি ঠিক ক'রে ব'লতে পার না। গোপীরা তোমার লীলার উপকরণ, তারা তোমার প্রিয় বন্ধুর মত সাহায্য করে, তারা গুরুর ন্যায় তোমাকে উপদেশ দেয়, শিষ্যের মত তোমার আজ্ঞানুসারী, দাসীর মত সেবা করে, তোমাকে পতিরূপে পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করে।

সহায়া গুরব, শিষ্যাঃ ভুজিষ্যাঃ বান্ধবাঃ স্ত্রিয়।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি নঃ ॥

রাজা কংসের ধনুর্যজ্ঞে যোগদান করতে তুমি যখন বলরামের সঙ্গে অক্রুর গাড়ীতে ব্রজধাম ছেড়ে মথুরায় যাচ্ছিলে তখন গোপীদের মনের ভাব, তোমার সঙ্গে তাদের কথোপকথন, গোপীদের উৎকণ্ঠা, তাদের প্রেম দেখে অক্রুর মনে হ'য়েছিল যেন পরজন্মে বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করেন। চলে যাওয়ার সময় তুমি বলেছিলে তুমি কি বৃন্দাবনকে ও গোপীদের ভুলতে পাব ? আবার আসবে ফিরে বৃন্দাবনে। খানিক দূরে গিয়ে যখন অক্রুর তোমাকে বলেছিল তোমাকে তার নিয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ যে তোমার মাতা-পিতা দেবকী ও বাসুদেব কংসের কারাগারে বন্দী, তাদের উদ্ধারের আশায় ; না হ'লে এ প্রেমময়-গোপীময়-বৃন্দাবন থেকে তোমাকে নিয়ে যেত না কিছুতেই। তা শুনে তুমি হাতের বাঁশী ও গলার গোপীদের দেওয়া বনমালা ফেলে দিয়ে ব্যস্ত হ'য়েছিলে মথুরা যাওয়ার জন্য।

বিচিত্র তোমার লীলা ও কীর্তিকলাপ। তুমি সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ অনুসারে কর্ম্মবিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করেছ। তুমি নিজেকে

টীকা : * গোপীরা হ'লেন কৃষ্ণের কান্তা। কান্তি শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণের সকল ইচ্ছা বোঝায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান, সেবা ও তার বাঞ্ছা তথা শ্রীকৃষ্ণের কান্তি পূরণ করাই ব্রজগোপীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—তাই তাঁরা হ'লেন কৃষ্ণকান্তা। শ্রীকৃষ্ণ প্রমোৎকর্ষে কৃষ্ণমহিষীদের চেয়ে গোপীরা ছিলেন শ্রেষ্ঠা কারণ মহিষীদের মধ্যে মহাভাব ছিল না—মহাভাব ছিল কেবলমাত্র গোপীদের মধ্যেই। গোপীরা সর্ব্বদা মহাভাববতী। এই দুর্ল্লভ মহাভাব তাঁদের মধ্যে ছিল ব'লেই তাঁরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমোৎকর্ষে শ্রেষ্ঠা। মন ও মনের সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের স্বরূপতা প্রাপ্তির নামই মহাভাব। 'স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ।'

মহাভাবের চারটি অবস্থা রয়েছে—(১) রূঢ় মহাভাব, (২) অধিরূঢ় মহাভাব, (৩) মোদন মহাভাব ও (৪) মাদন মহাভাব। প্রেমের ঘনিভূত স্তরই মাদন মহাভাব। আর এর মাদনাক্ষ্য মহাভাবকেই বলে স্বয়ংপ্রেম।

অকর্ত্তা ব'লে বলেছ অর্জ্জুনকে—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ গীঃ ৪/১৩

শুধু তাই নয় তুমি তোমার জীবনের সর্ব কর্ম্মের মধ্য দিয়ে তা পালন ক'রেছ। তুমি শ্রীগীতার মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রচার করেছ; উদ্ধত-অসৎ-হিংস্র-পরক্ষতিপরায়ণ রাজন্যবর্গকে নিধন ক'রে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন ক'রেছ, বৃন্দাবনে গোপালনাদি বৈশ্যকুলোচিত কর্ম্ম করে বৈশ্যের কর্ম্ম সম্পাদন করেছ; আবার যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে রাজন্যবর্গের পাদোদক বহন ক'রে, তাদের চরণ ধৌতি করে শূদ্রের কর্ম্ম পালন ক'রেছ।

গুণ ও কর্ম্মবিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান, শমদমাদি তাদের কর্ম্ম; ক্ষত্রিয় হ'ল সত্ত্বোপর্জ্জন রজোপ্রধান, তাদের কর্ম শৌর্য যুদ্ধাদি; বৈশ্য তমঃউপর্জ্জন রজ প্রধান, তাদের কর্ম কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য; রজঃউপসর্জ্জন তমঃ প্রধান শূদ্রের কর্ম হ'ল পরিচর্য্যা।

* টীকা: ভারতীয় সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য হ'ল মানুষকে শূদ্র ভাব থেকে ক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণভাবের মধ্য দিয়ে পূর্ণমনুষ্যত্বের আধিকারী করে তোলে অর্থাৎ ঈশ্বর অনুভূতি বা ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভ করায়। তাই মহাত্মা যুধিষ্ঠির অজগরের প্রশ্নে ব'লেছিলেন—

'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠবোদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

এ পৃথিবীতে জন্মলাভই মানুষের শূদ্রভাবপ্রাপ্তি। শূদ্রভাবের কাজ হ'ল ভগবৎ সাধনা আরম্ভের আগের কাজ। বৈশ্যভাব বা অবস্থা হ'ল সাধনার প্রথম ক্রম আরম্ভ। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যই হ'ল বৈশ্য অবস্থার বা সাধনার প্রথম অবস্থার কাজ। এ হল মৃদুভাবের সাধনা।

কৃষি—ক্ষেত্র কর্ষণ, আগাছা উৎপাটন বা উত্তোলন, বীজবপন ও সেচনই হ'ল কৃষির প্রধান কাজ। মানুষের শরীর বা দেহরূপ ক্ষেত্রে যম, নিয়ম, আসনাদির সহযোগে দেহের সকল অজ্ঞানাদিরূপ আগাছা নির্মূল করে কর্ষণ করার পর গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র গুরু প্রদর্শিত ক্রমে দেহের সমস্ত চক্রগুলোতে জপ করার মধ্য দিয়ে অর্পণ করার নামই হ'ল বীজ বপন। বীজমন্ত্র বা ইষ্টমন্ত্র গুরু নির্দিষ্ট ক্রমে পূরক, কুম্ভক ও রেচকাদি সহযোগে বার বার অভ্যাস করাকেই সেচন বলে।

গোরক্ষা—'গো' শব্দের অর্থ—দেহস্থ সকল ইন্দ্রিয়গুলিকেই বুঝায়। দেহস্থ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, ত্বগেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু) ও মন এই মোট দেহস্থ এগারটি ইন্দ্রিয়কে সংযমের দ্বারা সাধন উপযোগী ক'রে নিজের আয়ত্বে রাখার নামই গোরক্ষা।

বাণিজ্য—সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ ও মুনাফা করণই হ'ল ব্যবসা বা বাণিজ্য। কিন্তু সাধনক্ষেত্রে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার সহযোগে প্রাণ সম্পদাদির সমৃদ্ধিকরণই হ'ল বা প্রাণশক্তিরই বর্ধিতকরণই ব্যবসা বা বাণিজ্য। নাড়ীপথ ও সহজ সরল না হওয়া পর্যন্ত শ্বাসের ওপর কোনরকম বেগ না রেখে আত্মমন্ত্র তথ্য হংসের বিপরীত 'সোঽহং' মন্ত্র গুরুনির্দিষ্ট ক্রমে দেহস্থ মূলাধারচক্রে, স্বাধিষ্ঠান চক্রে, মণিপুরচক্রে, অনাহতচক্রে, বিশুদ্ধচক্রে ও আজ্ঞাচক্রে যথানিয়মে প্রাণায়াম ক'রে প্রাণশক্তিকে বর্ধিত করতে হয়। বার বার অভ্যাসের ফলে শ্বাস আয়ত্তে এলে, ধ্যানে প্রবৃত্ত হ'তে হয়, ধ্যানে গভীরভাবে মগ্ন থাকতে থাকতে তন্ময়তা এসে ক্রমে অল্প অল্প সমাধি ভাবের উদয় হয়। এ হ'ল বৈশ্য অবস্থার শেষ বা চরম অবস্থা।

ক্রমে তার আপেক্ষিক উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়ে ক্ষত্রিয় ভাব আরম্ভ হয়। তমোগুণ সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হ'য়ে সত্ব মিশ্রিত রজোগুণের প্রাবল্যসম্পন্ন হয় ক্ষত্রিয় ভাবের মধ্য দিয়ে—এ হ'ল তীব্রভাবের সাধনা। এ অবস্থায় সাধকের মধ্যে সমাধি ভাবের প্রাবল্য দেখা যায়—এ হ'ল শ্রীচণ্ডীর রজো গুণসম্পন্ন রাজা সুরথের সমাধি নামক বৈশ্যের সাক্ষাৎ লাভ।

"তত্রবিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১ । ১৭

(তারপর একদিন সেই আশ্রমের সামনেই এক বৈশ্যকে দেখতে পেলেন ।)

"সমাধির্ণাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে ।"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১ । ২১

(আমি সমাধি নামক বৈশ্য, ধনীদিগের কুলে আমার জন্ম ।)

ক্রমে সমাধিভাবের পরিপক্কতা দেখা দিলে, শ্বাস ক্রমে সূক্ষ্ম হ'য়ে অন্তরের মধ্যে নবোদিত সূর্যের রক্তিম উজ্জ্বল জ্যোতির মত এক রক্তিম আভা প্রস্ফুটিত হ'য়ে শরীর ও মনের উপর তেজের সঞ্চার করে। এতে ইচ্ছানুসারে প্রাণশক্তির সঞ্চারের ক্ষমতা লাভ হয়। এই অবস্থাতেই মূলাধার চক্রেস্থিত কুলকুণ্ডলিনীশক্তি তার ঘুমন্ত অবস্থা থেকে উঠে দেহের উপর দিকের চক্রগুলিতে ওঠার জন্য উন্মুখ হন। রজোগুণের প্রাধান্য দেহের মধ্যে অল্প অল্প কমতে থাকলে ও সত্ত্বগুণ অল্প অল্প করে প্রাধান্য পেতে থাকলে, কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারচক্র ছেড়ে উপরদিকে স্বাধিষ্ঠানচক্রে উঠে আসে, এরপর যখন রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের প্রভাব দেহের মধ্যে সমপরিমাণ হয়, তখন ঐ কুলকুণ্ডলিনীশক্তি স্বাধিষ্ঠানচক্র থেকে এসে মণিপুরচক্রে অবস্থান করে, কিন্তু আর উপরে উঠতে পারে না—যতক্ষণ রজোগুণ সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হ'য়ে দেহের মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশ না হয়। সত্ত্ব ও রজঃ ভাবের সাম্যাবস্থাতেই কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি মণিপুরচক্রে থাকে বটে কিন্তু সত্ত্বভাবের পরিমাণ হ্রাস হ'লেই আস্তে আস্তে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি নীচের দিকে নামতে থাকে। মণিপুর-চক্র হ'ল পাঁচটি স্থূল ও পাঁচটি সূক্ষ্মবৃত্তি বিশিষ্ট দশদল পদ্ম ; এটা অগ্নি তত্ত্বের স্থান, এখানে -বহ্নির ত্রিকোণমণ্ডল আছে ও তার মধ্যে বহ্নি-বীজ-'র', বিদ্যমান। এখানে প্রাণময়কোষের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থূলভাবের কাজ শেষ ও সূক্ষ্মভাবের কাজ আরম্ভ হয় এই চক্রে। স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বর্তমান ও বিন্দু আকারে পাঁচ বিন্দুতে দৌ, পর্জ্জন্য,

'আচ্ছা প্রভু! একটা প্রশ্ন ক'রতে খুব ইচ্ছা ক'রছে?'—ভগবান ব'ললেন—'বল।'

আমি ব'ললাম—'গোপীরা যখন প্রত্যেকে তাদের কাছে কৃষ্ণকে পেয়ে মনে মনে গর্ব অনুভব ক'রছিল তখন কি তুমি অন্তর্হিত হ'য়েছিল ঐ স্থান থেকে? না—গোপীরা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ভাবাপন্ন তথা জগৎবোধের দিকে সাময়িক মননিবিষ্ট ক'রেছিল ব'লে তুমি ঐ স্থানে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তারা তোমাকে দেখতে পায়নি? আবার যখন তারা জগতবোধকে দূরে ঠেলে দিয়ে আত্মবোধে তথা ভগবৎ বোধে আবিষ্ট হ'য়েছিল তখন তারা আবার দেখতে পেয়েছিল তোমাকে ঐখানেই?'

'তোমার অনুভব মিথ্যা নয়।' হাসতে হাসতে বললেন শ্রীকৃষ্ণ।

'প্রভু! তুমি লীলাময়, তোমার এ লীলা অনুধাবন সকলের সাধ্য নয়। তোমার এ-লীলার ভাব-রাজ্যে প্রবেশের প্রবল ইচ্ছা থাকলে মানুষের প্রথম করণীয় কি?'

পৃথিবী, পুরু ও যোযা এই দেহস্থ পঞ্চ অগ্নি বিদ্যমান। বিন্দুর অপর নাম বটিকা বা বটি, তাই মনিপুরচক্রে এই পঞ্চ অগ্নি বিন্দু বিন্দু আকারে বা বটিকা আকারে থাকে ব'লে, মণিপুরচক্রকে সাধকরা পঞ্চবটী বলে থাকেন। এই স্থানটি সবসময় মণির মতো উজ্জল থাকে; তাই এর নাম হয়েছে মণিপুরচক্র। কুলকুণ্ডলিনীশক্তি এই মণিপুরচক্রে উঠলে এই মণিপুরচক্রের মধ্যস্থ উজ্জ্বল আলোকে তার ছায়া সরাসরি রজোগুণে উদ্দীপ্ত হয়ে আজ্ঞাচক্রে এসে প্রতিফলিত হয়। রজোগুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয় অবস্থায়, সাধকের কাছে তেজ ও চাঞ্চল্যের প্রভাবে ঐ শক্তির উজ্জ্বল ছায়া বা আভা-ই আসল কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরূপে মায়াচ্ছন্ন হ'য়ে ভুলবশতঃ প্রতিভাত হয়। ক্রমে ক্ষত্রিয় অবস্থা থেকে ব্রাহ্মণ অবস্থার উত্তরণ ঘটে। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে (আমার লেখা জপাৎ সিদ্ধি বই-এর বই-এর ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শ্রীগীতার বর্ণবিভাগ জন্মগত ভাবের উপরভিত্তি ক'রে হয়নি. কর্মাধীন মাত্র।

ভগবান ব'ললেন, 'আমার প্রেমময় লীলা রাজ্যে প্রবেশের উপায় তো—২নং সিকরা রোড়, বারানসীতে বসবাস কালে মহাযোগী বিশুদ্ধানন্দের শিষ্য মহামোহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ পরিস্কার ভাবে ব্যক্ত করেছেন—'ভাবরাজ্যে প্রবেশ করার মূখ্য উপায় হ'ল মহাইচ্ছার স্রোতে স্বীয়ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দেওয়া। প্রতিদানে কিছুই পাইবার আশা না করিয়া নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও শুভাশুভ বোধকে চিরদিনের জন্য অর্পণ করা। যে মহাইচ্ছাভাব জগতে অব্যাহত গতিতে ক্রীড়া করিয়া থাকে তাহাই মনুষ্যচিত্তে খণ্ড ইচ্ছারূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু মনুষ্য কর্ত্তৃত্বাভিমানবিশিষ্ট বলিয়া স্বীয় ইচ্ছাকে ও বিচার শক্তি বিসর্জ্জন দিতে চাহে না। গুরু আজ্ঞা বা শাস্ত্রের আদেশ পালন করিতে না পারিলে নিত্যধামে স্বীয় ভাবানুরূপ স্থিতিলাভ করা যায় না। বস্তুতঃ বিনা বিচারে নিজের ইচ্ছার বিসর্জ্জন দেওয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া অতীতের চিন্তা না করিয়া বর্তমানের দোষগুণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক তাহার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাযুক্ত করা। ইহাতে অতি সহজেই কর্মবন্ধন কাটিয়া যায় এবং ভাবরাজ্যে প্রবেশের দ্বার খুলিয়া যায়।

জীব স্বাধীন কি পরাধীন সে বিচার উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে ইহা সত্য যে, সে একদিকে স্বাধীন এবং অপরদিকে সম্পূর্ণ অপরের অধীন। জাগতিক ঘটনা পরস্পরা কার্য্যকারণ ভাবে বিন্যস্ত শক্তিবর্গের পরস্পর সংঘর্ষের ফল। কারণ্যানুরূপ কার্য্যের উদ্ভব এই নিয়মেই হইয়া থাকে। ইহাই নিয়তির অধীন। সাধক জীব গুরুউপদিষ্ট সাধনার দ্বারা এই নিয়তি অথবা কালশক্তিকেই জয় করিয়া থাকে। তখন সে ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। মানুষ চৈতন্যস্বরূপে স্বাধীন কিন্তু দেহ সম্বন্ধবশতঃ দেহের দিক দিয়া পরাধীন। ভগবৎ শক্তির প্রতিনিধিরূপে গুরুর ইচ্ছা সাধক জীবনে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাই আজ্ঞারূপে অথবা বিধিনিষেধরূপে

প্রকাশিত হয়। জীব নিজের ইচ্ছাকে ব্যাপক ইচ্ছার সঙ্গে সজ্ঞানে যোগ করিতে পারিলে, অশেষ ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। জীব স্বাধীন বলিয়া তাহার ইচ্ছা অর্পণ সম্পূর্ণভাবে তাহারই অধীন। সে নির্বিচারে গুরুর আদেশ গ্রহণ করিতে পারে অথবা ইচ্ছা করিলে নাও করতে পারে। এই ক্ষেত্রে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। এই স্থলে তাহার ফলাফল দেখিবার আবশ্যকতা নাই। তাহার স্ব-ইচ্ছাকে নির্ব্বিচারে গুরুআজ্ঞার সম্মুখে প্রসন্নচিত্তে বলিদান করিতে পারিলে গুরুর অহেতুক কৃপা লাভ করিতে পারা যায়। অহেতুক কৃপা লাভ করিতে হইলে নিজের আত্মবিসর্জ্জনও অহেতুক হওয়া আবশ্যক। ইহাই মহাবিশ্বাস ও নির্ভর রহস্য। ইহার ফলে ক্ষণিকের জন্য সঠিক, ইচ্ছাধীন হইয়া তারপর ভাবরাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। তখন ভাবাদিচ্ছাই সব ইচ্ছারূপে কার্য্য করিয়া থাকে। এই ভাবরাজ্যে একমাত্র ইচ্ছা সর্ব্বত্র অনন্তরূপে ক্রীড়া করিতেছে। এই ইচ্ছা বস্তুতঃ কাহারও ইচ্ছা নহে—ইহা অনিচ্ছা অথবা স্বভাবের মেলা। এই ইচ্ছাই মায়াবতী অভাব, যাহা হইতে অনন্তলীলাবিলাস অনন্ত-রূপে প্রকাশ পাইতেছে। যে দিন এই অনন্তভাবের উপশম হইবে সেই-দিন জীব নিত্যলীলার মধ্যেও লীলাতীতভাবে বিশ্রাম লাভ করিবে।'

'শ্রীশ্রীগীতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষার বিভিন্ন মত। অদ্বৈতবাদী ভগবান শঙ্করাচার্য্য খুব চাঁছা-ছোলা মানুষ। কথাবার্ত্তা রসিয়ে রসিয়ে বলতে জানতেন না, সোজাসুজি ব'লে দিতেন। তাই তোমার বাণী তথা শ্রীশ্রীগীতা প'ড়ে বললেন, 'দুর্বিজ্ঞেয়ার্থ'—অর্থাৎ অর্থ উপলব্ধি কঠিন। তাঁর জ্ঞান অতুলনীয়। তিনি ব'ললেন—'ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা।' তাঁর কথা তো আর মিথ্যে হ'তে পারে না। তবে কিনা তাঁর এসব শক্ত তত্ত্বকথা আমার বোধ দরজা দিয়ে চট্ ক'রে ঢুকতে চায় না। ঠেলে ঠুলে ঢোকালেও তা বেরিয়ে আসে।

আমার কি মনে হয় জানো ঠাকুর! ব্রহ্ম যখন সত্যি, তখন তাঁর সৃষ্টি মিথ্যে হ'তে পারে কি? অতএব এ জগৎ তাঁরই সৃষ্টি, কি ক'রে তাকে মিথ্যে ব'লে ভাবি বলতো? আমার কেন জানি মনে হয় ব্রহ্ম যখন সত্যি, তখন তাঁর সৃষ্টি এ জগৎও সত্যি। সত্যি আমার মা, বাপ, ভাই, বন্ধু-বান্ধব, ছেলে-পুলে সব সত্যি, সব সত্যি—সত্যি ছাড়া কিছু নয়। তা না হ'লে তুমি মা-যশোদার গোপাল, নন্দের দুলাল হ'লে কি ক'রে? সুবল-সুদাম-শ্রীদামের বন্ধু হ'লে কি ক'রে? বলরামের ভাই বা কি ক'রে হ'লে? আমাকে বাপু তুমি আচার্য্য শঙ্করের মতো অতো শক্তভাবের মানুষ ক'রো না যেন। একটু রসে বশে থাকতে দিও—যা ঠাকুর রামকৃষ্ণ মায়ের কাছে চেয়েছিলেন, "রসে বশে রাখিস মা"। রসে সিক্ত একেবারে প্রাণবন্ত—ঢল ঢল জীবন্ত। আর বশে শক্ত। কারণ সংযমই হ'ল শক্তির উৎস।'

*আমাদের প্রজ্ঞাবান ঋষিকুল যেমন তিনকালকে দেখতেন তেমন দেখতেন সত্যকে তিন ভাবে ব'লেই তাঁদের ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বলা হ'তো।

ব্যাসদেব হ'লেন শ্রীশ্রীগীতার ঋষি। তিনিও ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ বা মনীষা। তাই তিনিও শ্রীশ্রীগীতাকে দেখেছেন (১) অধিভৌতিক (২) অধিদৈবিক ও (৩) আধ্যাত্মিক ভাবে, তিন প্রকারে।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম পাঁচটি ভূত অনুপাত ক্রমে মিশ্রিত হ'য়ে জগতে সব কিছু পদার্থ বা বস্তু তৈরী করে, তাকে

টীকা: * কাল কি? কাল হ'ল মৃত্যু—কলয়তি, ভক্ষতি যঃ সঃ কালঃ। যে ভক্ষণ করে সে কাল। মুহূর্ত্ত, নিমেষ, পল, বিপল, দণ্ড, প্রহর, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বৎসর-এর ক্রম হ'ল কালের রূপ। ঐ পল-বিপল-দিন-মাস-বৎসর ধ'রে ধ'রে কাল তথা মৃত্যু আমাদের খেয়ে চ'লেছে। আর সত্য কি? সত্য হ'ল—স+ত+য। 'স' মানে জন্ম, 'ত' অর্থে লয়, 'য' অর্থে নিয়ন্ত্রাত্মক জ্ঞাপক অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রক—শ্রীভগবান।

ভৌতিক পদার্থ বলে। আকাশে, অন্তরীক্ষে যে সব বস্তু দেখা যায় বা অনুভূত হয় যেমন বাতাস, সূর্য্য, চাঁদ প্রভৃতি—সেগুলি হ'ল দৈবিক। [দৈবিক কথাটা এসেছে দিব্ ধাতু থেকে। দিব্ ধাতুর অর্থ হ'ল প্রকাশ বা দীপ্তি পাওয়া।] আমাদের এ শরীর ও তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মন প্রভৃতি আমাদের নিজের ব'লে এগুলিকে আত্মিক বলা হয়। অধি—মানে সম্বন্ধীয়। ভৌতিক, দৈবিক ও আত্মিক শব্দগুলির আগে অধি ব'সে অধিভৌতিক, অধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক কথাগুলির সৃষ্টি হ'য়েছে। যাইহোক এইভাবে শ্রীশ্রীগীতাকে তিন সত্যে দেখেছিলেন ব'লেই—শ্রীগীতা দার্শনিকের কাছে দর্শন, জ্ঞানীর কাছে জ্ঞানশাস্ত্র, যোগীর কাছে যোগশাস্ত্র, ভক্তিমানের কাছে ভক্তিরসামৃত, বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিকের কাছে ইতিহাস হ'য়ে চির-ভাস্বরোজ্জ্বল।'—বললেন শ্রীকৃষ্ণ।

'আসলে কি জান ঠাকুর! আমাদের এই বুদ্ধির ঘট-টা খুবই ছোট্ট। এ ঘটে বেশী বড় কিছু ধরে না ব'লেই বোধও প্রকাশ পায় না ঠিক্ ঠিক্ মত। যার ফলে বুদ্ধিতে সঠিক প্রতিভাত না হ'য়ে যে যার নিজের মতো ক'রে বুঝে ফেলি বা একটা ধারণা ক'রে নিজের ইগো তথা অহংত্বের সুড় সুড়ি দিয়ে উল্টো ধারণা ক'রে বসি প্রায় সব কিছু জিনিষকেই। এই উল্টো ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে কত আজে বাজে কথা বলি কিংবা কাজ ক'রে বসি—তাতে আসল সত্য হয় উপেক্ষিত এবং অসত্যকে সত্য ব'লে ভেবে বসি।'

ভগবান বললেন,—"গঙ্গাকে মাগঙ্গা ব'লে ভাবতে না শিখলে, শুধু জল ভেবে গঙ্গাস্নানে কোন ফল প্রাপ্তি ঘটে না। কোন বিষয়কে সম্যকভাবে অনুভব করাই সেই বিষয়ে সত্যানুভূতি লাভ করা। আসলে মানুষ, কথা তথা বাক্য দিয়েই অথবা আলোচনা ক'রেই তা অনুভব করতে বা জানতে ভালবাসে সেইজন্যেই তাদের অনুভূতিতে আসল সত্য অনুভূত না হ'য়ে তার আভাস আসে মাত্র। কোন

বিষয়কে যেমন কথা তথা বাক্য দিয়ে জানতে বা বুঝতে হবে ঠিক তেমনি জানতে হবে মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আস্তিক্য দিয়েও তবেই আসল সত্য উপলব্ধি হবে। না হ'লে—নয়। 'আমি' তথা ভগবান আছেন—এ শুধু কথার কথা বা বাক্য হ'লে হবে না—মন, প্রাণ ও আস্তিক্য দিয়ে বুঝা বা জানা চাই। আমি আছি ব'লেই তোমাদের প্রাণ সচল আছে—চ'লছো, ব'ল্‌ছো, কাজ ক'রছো—তথা জীবন্ত প্রাণবন্ত—না হ'লেই কিন্তু তোমরা জড়। তোমাদের অনেকেরই ক্ষোভ যে ভগবান সবাইকে দয়া করেন না। অযথাই আমার উপর ক্ষোভ তোমাদের, তুমি বলতো কজন ঠিক ঠিক মতো আমাকে চায়? মন্দিরে ঠিক ঠিক যায় কত জন ব'লতে পার? কেউ গেল বাজার ক'রতে বা কেনা কাটা ক'রতে; সব কাজ হ'য়ে গেলে ফেরার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে হাতে সময় থাকলে একটু, মন্দিরে যায়; কেউ পাঁচটা কাজ সারতে গিয়ে মন্দিরে আর একটা কাজ—ঠাকুর দেখে যায়; কেউ কেউ সোজাসুজিই মন্দিরে আসে ঠাকুরের কাছে নানান বিপদে প'ড়ে কিংবা কোন সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রার্থনা নিয়ে। হাজারে একজন হয়তো আসে আমাকে পথ দেখাও ঠাকুর ব'লে প্রার্থনা নিয়ে। ক-জন লোক প্রয়োজন ছাড়া আমাকে দেখতে আসে বলতো? সবার মধ্যেই সর্ব্বঅস্তিত্বময়, বোধময়, প্রাণময় আত্মা অন্তর ও বাহ্যে বর্ত্তমান থাকেন। আমি অর্জ্জুনকে বলেছিলাম—

'জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুম্।'

একই মানুষকেই দেখে প্রতি জনে জনে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়—যেমন মায়ের বুকে পুত্রবোধ, স্ত্রীর বুকে স্বামীবোধ, পুত্রের বুকে পিতৃবোধ জেগে উঠে। সাধুকে ভক্তি করে মানুষ আর অসৎ লোককে দেখে ঘৃণা করে মানুষ কেন? আসলে সাধুকে দেখে তার সাধুবোধের

বিকাশ ঘটে, আর অসৎ লোককে দেখে তার অসৎভাব উদ্দীপ্ত হয় ব'লে। যার যা ভাব তার তাই লাভ। বোধের তারতম্যেই, ফলের তারতম্য। নিষাদকুমার একলব্যের মধ্যে গুরুবোধ জেগেছিল মহামতি দ্রোণাচার্য্যকে দেখে। সেই বোধের ফলেই তার গুরুলাভ হ'য়েছিল এবং গুরুবিদ্যার অধিকার এসেছিল। সেই অধিকার বলেই নিষাদকুমার অতবড় ধনুর্ধর হ'য়েছিল। মানুষ প্রত্যেকে তার নিজস্ব বোধের জগতেই বাস করে। বোধই তাকে তার মত ফল দেয়, কি বদ্ধ অবস্থায়—কি মুক্ত অবস্থায়। বোধের বোধনের জন্যই এত পূজা-অর্চনা, যজ্ঞ, প্রার্থনা কিংবা মনন। দেখ! জীবনকে আধ্যাত্ম-বোধে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজন—(১) আস্তিক্য বোধ, (২) আশ্রয়—আশ্রিতবোধ, (৩) আত্মীয়বোধ ও (৪) আত্মবোধের।

আস্তিক্য বোধ—অর্থ হ'ল অস্তিত্বে উপলব্ধি বোধ। অর্থাৎ ভগবান তথা আমি যে আছি এ জ্ঞান লাভ করা। এর জন্য অনু-শীলনের প্রয়োজন; দৃঢ় বিশ্বাসে উপাসনা করা চাই। এ উপাসনা হ'ল মানুষের ঋণ শোধের। এ জগতে জন্মাবার সাথে সাথে মানুষ ঋণী হয় পাঁচটি ঋণে, যথা—(১) দেব ঋণ, (২) ঋষি ও গুরু ঋণ, (৩) পিতৃ-মাতৃ ঋণ, (৪) নৃ-ঋণ ও (৫) ভূত ঋণ। দেব ঋণ দেব সেবায়, ঋষি ঋণ ও গুরু ঋণ শাস্ত্র পাঠে ও গুরু সেবায়, পিতৃ-মাতৃ ঋণ পিতামাতা সেবা ও গত হ'লে তর্পণে, নৃ-ঋণ অতিথি সেবায় ও দানে, ভূত ঋণ পশু পাখীর পরিচর্য্যায় মানুষ মুক্তি লাভ ক'রে থাকে। শ্রদ্ধাবান ও সংযতেন্দ্রিয় হওয়া চাই; তাই আমি অর্জ্জুনকে ব'লেছিলাম—'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।' যিনি শ্রদ্ধাবান, তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় তিনি জ্ঞান লাভ করেন। শ্রদ্ধা—শ্রৎ+ধা। শ্রৎ মানে বিশ্বাস তথা বিগত শ্বাস, 'ধা' অর্থে ধারণ বা পোষণ করা। শ্বাসকার্য্য থেকে মনকে তুলে নিয়ে অন্তরে পোষণ করার নাম শ্রদ্ধা। সাধন ক্রমে এই স্তরে এলে সাধক হন শ্রদ্ধাবান।

এই অবস্থায় সাধকের মধ্যে সূক্ষ্মাদি দর্শন-শ্রবণ-মনন ক্রিয়া চলতে থাকে, তাকে একাগ্র ক'রে নাদবিন্দুতে নিযুক্ত ক'রতে তৎপর অবস্থার হয় উদয়। ক্রমে এ বৃত্তিগুলি একে আকৃষ্ট হওয়ার দরুণ স্ব স্ব পৃথক কর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে সংযতভাবে আসে ও পরস্পর মিলে মিশে এক হ'য়ে যায়—এই অবস্থাকেই সংযতেন্দ্রিয় বলে। এই অবস্থা এলে সাধকের হয় জ্ঞান লাভ যে ভগবান আছেন। কঠ উপনিষদ্ ব'লছে—

অস্তীত্যেবোপলব্ধঃ তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীতোবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদাত॥

ভগবানকে দুভাবে উপলব্ধি ক'রতে হয়—(১) অস্তি অর্থাৎ তিনি আছেন; (২) তত্ত্বে বা স্বরূপে। অস্তিত্বের উপলব্ধি ক'রতে হ'লে আগে জানতে হবে তিনি কে? তাঁর সঙ্গে এ জগতের ও আমার সম্বন্ধ কি? মানুষ যার অস্তিত্বে বিশ্বাস ক'রতে চাইছে সে কি, বা কেমন, তার কর্ম্ম ধর্ম্মই বা কি, না জানলে তার অস্তিত্ব বুঝবে কি ক'রে? যার থেকে এ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়—যাতে তোমরা সবাই, এ বিশ্বের সব কিছুই জাত ও স্থিত এবং কালক্রমে যাতে লীন হবে সেই আমি তথা ভগবান। এ কথা সদা-সর্ব্বদা নিঃসন্দেহে, অসংশয়ে মনে রাখা উচিত। মানুষের মন দুর্নিগ্রহ ও সদাচঞ্চল, একথা আমি জানি ব'লেই অর্জ্জুনকে আমি ব'লেছিলাম—

'অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥' ৬/৩৫

(মহাবাহো! মনের চঞ্চলতা ও দুর্নিগ্রহতা সম্বন্ধে কোন সংশয়

নেই। কিন্তু হে কুন্তী নন্দন! মনকে বার বার অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীভূত করা যায়।)

এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য বলে মনের চঞ্চলতা দূর হ'লে মানুষের স্ব চেতনার অস্তিত্বই প্রত্যক্ষভাবে আমার তথা ভগবানের অস্তিত্ব দেখিয়ে দেবে। এ জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্র সহজে যখন মানুষের জ্ঞানে ভগবানকে দেখছে—এ বোধ ফুটে উঠবে, তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা আসবে তখনই আস্তিক্য বোধের প্রতিষ্ঠা হয় মানুষের হৃদয়ে। তিনি এ জগৎরূপ—এভাবে দেখলেই মানুষ দ্বিভাবে আস্তিক্য বোধে উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে উঠবে। এক তিনিই এ জগৎ, তাঁকে দেখছে মানুষ তো আবার এ জগৎই তিনি—এইভাবে অনুভবে মানুষের মধ্যে জাগে জগৎবোধ, দেহবোধ, মনবোধ, প্রাণবোধ—অহংবোধ প্রভৃতির।

* আশ্রয়—আশ্রিতবোধ—যখন আস্তিক্যবোধের দৃঢ় ধারণায় ভগবৎ অস্তিত্ব মানুষের বাহ্যে ও অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখনই জাগে আশ্রয় ও আশ্রিত বোধ। ভগবান এ জগৎ ও জীব ও সকল বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা। আমি তথা ভগবান এ জগতের সব কিছুর সব প্রাণীর স্রষ্টা। মানুষ ও জগৎ আমারই সৃষ্টি, আমিই এ জগতের আত্মা, মানুষেরও আত্মা। মানুষ ভগবান থেকে সৃষ্টি হ'য়ে ভগবানেই অবস্থান ক'রছে। অতএব মানুষের মূল আশ্রয় হ'ল ভগবান এবং মানুষই হ'ল ভগবানের আশ্রিত।'

"সব মানুষই তোমার তথা ভগবান সত্তা থেকে উদ্ভূত বা জাত হ'য়ে তোমাতে তথা ভগবান সত্তায় স্থিত বা অবস্থিত। তা হ'লে

টীকা: * রসসাধনায় পাঁচটি আশ্রয়। এই সাধনায় তিনটি অবস্থা—(১) প্রবর্ত্ত, (২) মঞ্জুরী ও (৩) সখী। প্রবর্ত্ত অবস্থায় দুটি আশ্রয়—(ক) নাম ও (খ) মন্ত্র। মঞ্জুরীর অবস্থায় ভাবই একমাত্র আশ্রয়। সখী অবস্থায় দুটি আশ্রয়—(ক) প্রেম ও (খ) রস। বৈরাগ্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সম্পূর্ণ রূপে কামজয় না হ'লে আশ্রয় ভাব গ্রহণ করা যায় না।

মানুষে মানুষে এত প্রভেদ, এ পার্থক্য কেন?"—প্রশ্ন ক'রলাম আমি।

উত্তরে ভগবান ব'ললেন,—"আমার আগে আরো আট জন অবতার এসেছেন এ পৃথিবীতে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম—সবাই শ্রীবিষ্ণুর অবতার, কিন্তু কি বিচিত্র তাঁদের ভাব ও রূপ কেউ কারুর মতো নয়। মাটির তলায়, মাটির উপাদান নিয়ে গঠিত হয় কত রকমের খনিজ পদার্থ,—হীরা, চুনী, পান্না, পদ্মরাগ, নীলা, কয়লা, লোহা, অভ্র প্রভৃতি কত কি। সবই মাটির তলায় মাটির উপাদানেই গঠিত, কিন্তু তাদের ব্যবহারিক সত্ত্বা বিভিন্ন রকম। প্রতিটি পদার্থের ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন গুণ। সেই রকম ভগবৎ সত্ত্বা থেকে উৎপন্ন হ'য়ে ভগবৎ সত্ত্বায় অবস্থান ক'রেও প্রতিটি মানুষ ভিন্ন রকমের – কেউ কারুর মতো নয়। জন্মবিবর্ত্তন ও কর্ম্মের ধারা ও ফল অনুসারে মানুষে মানুষে এত প্রভেদ বা পার্থক্য। আর সেই পার্থক্য বোধটা কোথা থেকে বোঝা যায় জান? বোঝা যায় মানুষের monstery impulse এবং submissive impulse এই দুই-এর সামঞ্জস্যের অভাব থেকে। আসলে প্রারব্ধ কর্ম্মফলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণগুলির প্রভাবেই মানুষের মধ্যে আসে মানসিক সমতা, প্রাণ-শক্তির উচ্ছাস ও কর্ম্ম-অনীহা প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তি। প্রাণশক্তির তারতম্য ও সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে তিনভাবে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উচ্ছাস প্রাণচাঞ্চল্য ও আত্মপ্রাধান্য আসে রাজোগুণের প্রভাবে; প্রাণশক্তির স্তিমিতচাঞ্চল্য ও আত্মজড়তা আসে তমোগুণের প্রভাবে; সত্ত্বগুণ প্রভাবে আসে সাম্যাবস্থা ও শান্ত অবস্থা। একই সঙ্গে একই মানুষের মধ্যে একাধিক গুণের কম বেশী সমাবেশও দেখা যায়। সত্ত্বের স্বভাব প্রকাশময়তা, রজের স্বভাব আবেগ ও গতিময়তা আর তমের স্বভাব হ'ল আবরণাত্মক। তাই আমি অর্জ্জুনকে ব'লেছিলাম—

'সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মনি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥' ১৪।৯

(সত্ত্বগুণ সাধ্য বিষয়ে, রজোগুণ সাধ্যকর্ম্মে মানুষকে নিয়োজিত করে ও তমোগুণ বিবেককে আচ্ছন্ন ক'রে প্রমোদ ও আলস্য বা জড়তায় করে নিমজ্জিত।)

'লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১৪।১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৪।১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥' ১৪।১৪

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! রাজোগুণের বৃদ্ধিতে লোভ, কর্ম্মে প্রবৃত্তি, কর্ম্মে উদ্যম, বিষয় স্পৃহা ও কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা জাগে।

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে উদ্যমহীনতা, কর্ত্তব্যে অবহেলা, মূঢ়তা ও বিবেকের অভাব দেখা দেয়।

সত্ত্বগুণযুক্ত অবস্থায় মানুষের দেহত্যাগ ঘটলে, মানুষ উত্তম বিদাম মল-রহিত সুখস্থানময় ব্রহ্মলোকে গমন ক'রে থাকে।

'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥' ১৪।১৭

রজঃ ও তমোগুণ পরাভূত হ'য়ে সত্ত্বগুণ থেকে সব ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান লাভ হয়। সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত ক'রে রজোগুণ লোভের

প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে। সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত ক'রতে পারলে তমোগুণ থেকে জন্ম নেয় অজ্ঞানতা, অবিবেক ও মূঢ়তা।

'কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখম জ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥' ১৪।১৬

সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল হয় নির্ম্মল, সুখপ্রদ। রাজসিক কর্ম্মের ফলে লাভ হয় দুঃখ এবং মূঢ়তা লাভ হয় তামসিক কর্ম্মে।

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যুৎসদনং মন্নিকেতান্তু নির্গুণম্॥

(বনকে সাত্ত্বিক, গ্রামকে রাজসিক, জুয়োখেলাদির স্থানকে তামসিক ও ভগবৎ-ধামকে নির্গুণ-বাসস্থান বলে।)

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতা।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥

(বিষয় আসক্তিশূন্য কর্ম কর্ত্তা সাত্ত্বিক, ফলের অভিসন্ধিযুক্ত কর্ম কর্ত্তা রাজসিক ও হিতাহিত বিবেক বর্জিত কর্ম কর্ত্তাকে তামসিক ও যারা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ক'রে কর্ম অনুষ্ঠান করে তাঁরা হ'লেন গুণাতীত কর্ত্তা।)

*আত্মীয় বোধ—মানুষ যখন বুঝতে পারে সে ভগবৎ আত্মা থেকে

টীকা : * সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের উপরে আর এক নির্গুণ অবস্থা আছে। ভাগবত ব'লছে—

বৈকলং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজোঃ বৈকল্পিকং চ যৎ।
প্রকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥

(আত্ম-সাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান, দেহকে আত্মা বলে উপলব্ধি করার জ্ঞানকে রাজসিক আর জাগতিক বস্তুর প্রতি মমতা ভাবকে তামসিক জ্ঞান বলে।)

জাত এবং ভগবানই তার আত্মা, তখন তার মধ্যে আত্মীয় বোধের উদয় হয়। ভগবান তার প্রাণের-প্রাণ, আত্মার-আত্মীয় ভেবে তার ও ভগবানের সঙ্গে এক সম্বন্ধ গ'ড়ে তোলে—পিতা, মাতা, বন্ধু, পতি প্রভৃতি ভাবে। ফলে তার মধ্যে সাধন-সাচ্ছন্দ্য আসে, ভগবান সম্বন্ধে একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব দূর হ'য়ে যায়। ভগবানকে প্রাণের ধন বা প্রাণের প্রাণ ব'লে মনে করে। প্রাণের কিন্তু ছোট বড় নেই —সমভাব, অর্থাৎ সব প্রাণই সমান ও অনন্ত। তাই বেদ ব'লছে—

প্রাণাঃ সর্ব্বে সমাঃ সর্ব্বে অনন্তা।

কর্ম্ম হ'ল প্রাণের সজীবতা। কর্ম্ম দেখে প্রাণ আছে কিনা তা জানা যায়। প্রাণাত্বভাব জ্ঞানে এলে সব উপাসনার ঘটে সমাপ্তি জাগে শুধু 'পরম আমি' ভাবের অস্তিত্ব।

আত্মবোধ—মানুষের মধ্যে যখন ক্ষুদ্র আমিভাব অপসৃত হ'য়ে পরম আমি ভাবের চেতনা জাগে তখন আত্মবোধ জাগে তার প্রাণে। তখন সে ভাবে, সে নিজেই আত্মা এবং তার সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি জাগে। এ জগতের সব কিছুর মধ্যেই তার আত্মদর্শন লাভ হয়। যার ফলে সব কিছুই তার আত্মস্বরূপ জ্ঞানে অনুভূত হয়। সর্ব্বত্র আত্মজ্ঞানই সত্যব্রহ্ম। শ্রুতি তাই ব'লছে—

'ইদং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।'

আত্মা চার ভাবে হন প্রকাশিত। শাস্ত্রে তাই আত্মার চারটি পাদ—(১) প্রথম পাদ হ'ল বহিঃপ্রজ্ঞা, (২) দ্বিতীয় পাদ হ'ল অন্তঃপ্রজ্ঞা, (৩) তৃতীয় পাদ হ'ল প্রজ্ঞানঘন ও (৪) চতুর্থ পাদ হ'ল তুরীয় প্রজ্ঞা। ব্যবহারানুসারে বহিঃপ্রজ্ঞাকে বলে বৈশ্বানর

আত্মা, অন্তঃপ্রজ্ঞাকে বলে তৈজস আত্মা, প্রজ্ঞানঘনকে বলে অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ আত্মা, তুরীয় প্রজ্ঞাকে বলে পরমাত্মা।

আসলে ভগবান আছেন, এই আস্তিক্য বোধে মানুষ ভগবানকে আশ্রয় ক'রে, আত্মীয়বোধে, প্রাণবোধে, আত্মভাবে বিভোর হ'য়ে সেই চিন্ময়কেই তথা আমাকেই সেবা করে।"

'পন্থা কি ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'যোগ করো, করো জ্ঞানচর্চ্চা। প্রিয় ভক্ত হও, কর্ম্মী হও, সন্ন্যাসী হও, তোমার বোধের প্রসারতা লাভ হ'য়ে আসবে ক্রমে পূর্ণতা'—বললেন তিনি।

'প্রভু! তাই কি তুমি অর্জ্জুনকে ব'লেছিলে,—

'ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥' গীঃ ৩।৪

(কেউই নৈষ্কর্ম্য লাভ ক'রতে পারে না, কর্ম্ম না ক'রে। জ্ঞানশূন্য কর্ম্মত্যাগে ঐ অবস্থা লাভ সম্ভব নয়।)

'বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥' গীঃ ৪।১০

(ক্রোধশূন্য, ভয়শূন্য, আসক্তিশূন্য, মদগতচিত্ত ও শরণাগত ব্যক্তিরা জ্ঞানচর্চ্চা ক'রে পরাশুদ্ধি লাভ ক'রে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।)

'যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥' ১২।১৭

(যে ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট, অনিষ্ট প্রাপ্তিতে রুষ্ট হয় না, প্রিয়জনের

মৃত্যুতে শোক কিংবা অপ্রাপ্ত ইষ্টবস্তুতে আকাঙ্ক্ষা করে না ও শুভ-অশুভ সব কর্ম্মই ত্যাগ করে, সে-ই হয় আমার প্রিয় ভক্ত।)

'জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥' ৫।৩

(যে ব্যক্তি দুঃখকে ও সুখকে আকাঙ্ক্ষা না ক'রে রাগদ্বেষ শূন্য হন, সেই কর্মযোগীকে নিত্য সন্ন্যাসী ব'লে জানবে। হে মহাবাহু! রাগদ্বেষ দ্বন্দ্বহীন ব্যক্তি সংসার বন্ধন হ'তে অনায়াসে মুক্ত হন।)

এই কথাগুলি?

আচ্ছা ঠাকুর! আমাকে যে শ্রীগুরুলাভের কথা বললে, শ্রীগুরুলাভ তো মানুষের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্য। অবতার পুরুষদের তো আর গুরুলাভের প্রয়োজন হয় না?'

ভগবান ব'ললেন,—"এ পৃথিবীতে এসে যিনিই এ ভৌতিক দেহ ধারণ করেন অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেন, দিব্যভাবে কিংবা প্রাকৃতভাবেই হোক না কেন—তাকেই এ প্রকৃতির মায়ায় জাগতিক সব কিছুই ভোগ ক'রতে হয়। এই জাগতিক আবরণীমায়া থেকে মুক্ত হ'য়ে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্য শিক্ষালাভ, জ্ঞানলাভ ও দীক্ষাগ্রহণ ক'রে গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে ক্রম অগ্রসরের মধ্য দিয়ে পূর্ণত্ব লাভ ক'রতে হয়। আমিও যথাবিধি অনুসারে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলাম আচার্য্য সন্দীপনি মুনির কাছে ও দীক্ষালাভ ক'রেছিলাম মহাভাগ উপমন্যুর কাছে। তিনি আমাকে পাশুপত, যোগ শিক্ষাদান ক'রেছিলেন। এ যোগ শিক্ষান্তে আমি তাঁরই নির্দ্দেশ-ক্রমে দীর্ঘদিন ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর উপাসনায় ব্রতী হ'য়েছিলাম। আমার আরাধনায় প্রসন্ন হ'য়ে দেবী ত্রিপুরসুন্দরী আমাকে স্বরূপ উপলব্ধি তথা ব্রহ্ম উপলব্ধি করান। দেবী ত্রিপুরসুন্দরী (দশ মহা-

বিদ্যার এক বিদ্যা) আমাকে ব'লেছিলেন যে শক্তিসহ একযোগে কুলাচার সাধন না ক'রলে স্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠালাভ করা যায় না। আমি তাঁরই আদেশে কুলাচার সাধনে নিত্যসঙ্গীরূপে তাঁর অংশভূতা মহালক্ষ্মীস্বরূপা শক্তি রাধাকে বরণ ক'রেছিলাম। সেইজন্যই বাসুদেব তথা আমি এই *হরিনামের ঋষি ব'লে খ্যাত। আর এই হরিনামের দেবতা হ'ল দেবী ত্রিপুরসুন্দরী*।

টীকা: * হরি=হ+র+ই। 'হ'-মানে শিব, 'র'-মানে শক্তি, 'ই'-অর্থে— স্ত্রীরূপী অর্থাৎ শিবশক্তিরূপিনী ত্রিপুরসুন্দরী।

কৃষ্ণ=ক্+ঋ+ষ+ণ। 'ক'-অর্থে কাম, 'ঋ'-অর্থে পরমাশক্তি, উভয়ের মিলনে হয় কাম কলা; 'ষ'-অর্থে ষোড়শ কলাত্মক চন্দ্র, 'ণ'-অর্থে নিবৃত্তি তথা আনন্দ। সবে মিলে হয় ত্রিপুরসুন্দরী।

'হরিণাম্নেহি মন্ত্রস্য বাসুদেব ঋষিঃ স্মৃত। / গায়ত্রী ছন্দ ইত্যুঃক্তং ত্রিপুরা দেবতামতা॥'

* ১৫১১ সালের মাঝের দিকে দক্ষিণ ভারত থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন কালে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণবেন্বা নদীর তীরে এক প্রাচীন আদি-কেশব মন্দিরে রাত্রিবাস কালে এক অতিজীর্ণ পুঁথি থেকে জানতে পারেন—শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপুরসুন্দরী সাধনের কথা ও শ্রীকৃষ্ণের কুলাচার সাধনে রাধাকে নিত্যসঙ্গিণীরূপে গ্রহণের কথা। ঐ সূত্র থেকে তিনি সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণব সাধনার রসতত্ত্বে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের পাশে প্রতিষ্ঠা ক'রে বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে নব যুগের সূচনা করেছিলেন। রাধা-কৃষ্ণের যুগলতত্ত্ব হ'ল স্থিতি ও গতি, i.e. Statics Dynamics। রাধা হ'ল গতির ও শ্রীকৃষ্ণ হ'ল স্থিতির এবং তত্ত্বশাস্ত্র লক্ষণ প্রণালী ও সীমা নির্দ্দেশকার হ'ল ক্যালকুলাস্ (Calculas)। শ্রীকৃষ্ণ হ'তে রাধার স্ফুরণ হয় এবং এক অন্তরমুখী গতিতে শ্রীকৃষ্ণঅঙ্গে রাধা লয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব, রাধা শুধু শক্তিমাত্র। স্বতন্ত্ররূপে রাধার কোন স্থিতি নেই। এই রাধাই আহলাদিনী শক্তি। এই রসতত্ত্বের আস্বাদন ক'রে শ্রীচৈতন্যদেব নিজেই গোপীপ্রেমে বিভোর হ'য়ে

প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত যে কোন ভাবেই এ জগতে জন্মগ্রহণ হোক না কেন, মনুষ্যদেহ ধারণ বা কোন জীব বা প্রাণীদেহ ধারণ ক'রলে তার বিনাশ ঘটবেই। তাই আমি অর্জ্জুনকে ব'লেছিলাম—

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥' ২।২৭

(যে জন্মেছে তার মরণ নিশ্চিত এবং মৃতেরও জন্ম নিশ্চিত : অতএব এই অপরিহার্য্য ব্যাপাবে তোমার শোক করা উচিত নয়।)

শুধু তাই না, কর্ম্মানুসারে কোন সত্যনিষ্ঠ মানুষ কিংবা সাধ্বী রমণীদেরও অভিশাপ ভোগ ও আশীর্ব্বাদ কিংবা বরলাভ এ দেহে ভোগ ক'রতে হয়। কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মযুদ্ধে কৌরবরা সবাই বিনষ্ট হ'লে পুত্রশোকগ্রস্তা মাতা গান্ধারী আমাকে যা অভিশাপ দিয়েছিলেন তা ঘটেছিল আমার জীবনে, ঋষি অভিশপ্ত মুষলের এক খণ্ডে নির্মিত তীরে জরা নামে এক ব্যাধের দ্বারা বিদ্ধ হ'য়ে নিহত হ'য়েছিলাম আমি।'

'প্রভু! অবতার পুরুষের কি জাগতিক ভাবে মৃত্যু হয়?' জিজ্ঞেস ক'রলাম আমি।

ভগবান ব'ললেন,—"এ জগতে জন্মগ্রহণের পর সবাই এ জগৎ-নিয়মের অধীন থাকে, সেখানে অবতার পুরুষ ব'লে রেহাই নেই।"

আমি বললাম,—"তবে যে শুনেছি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর নরদেহ ত্যাগ না ক'রেই তিনি শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দেবের দারু-বিগ্রহে মিশে গিয়েছিলেন। তাঁর নরদেহের নাশ হয়নি অর্থাৎ তাঁর

থাকতেন। এই রসতত্ত্ব তিনি নিজে অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যেই প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নীলাচলে ফিরে আসেন ১৭.১.১৫১২ খৃষ্টাব্দে। সেই সময় উড়িষ্যার রাজা ছিলেন পুরুষোত্তম-দেবের পুত্র শ্রীপ্রতাপ রুদ্র দেব।

মৃত্যু হয়নি এবং তাঁর মরদেহও পাওয়া যায়নি।"

শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন,—"একটু আগে যে তোমায় ব'ললাম জন্ম হ'লে মৃত্যু অবধারিত। আমারও মৃত্যু হ'য়েছিল, মৃত্যু হ'য়েছিল আচার্য্য শঙ্করের, চৈতন্যদেবের এবং রামকৃষ্ণেরও। দেখ, অবতার পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি থাকা খুবই ভাল, কিন্তু অসত্য ধারণা পোষণ করা কিংবা মিথ্যা জ্ঞান কখনও কল্যাণকর হয় না। জন্মগ্রহণ ক'রে এ পৃথিবীতে যখন শ্রীচৈতন্যদেব দেহ ধারণ ক'রেছিলেন, তখন তাঁর এ দেহের নাশ তথা মৃত্যু ঘটেছেই। হয়তো শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর সঠিক কারণ ও তাঁর মরদেহের রক্ষণের কথা তোমাদের অজ্ঞাত থাকতে পারে মাত্র। ৩১শে আষাঢ়, রবিবার বঙ্গাব্দ ৯৪০, খৃষ্টাব্দ ১৫৩৩ শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে কি ঘটেছিল তা জানার জন্য উড়িষ্যার কবি শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাসের চৈতন্য-চকড়া দেখি এস……।

'কহিলে বৈষ্ণব দাস প্রত্যক্ষ যাহা জানি।'

প্রত্যক্ষ কি জেনেছিলেন বৈষ্ণবচরণ?—নিজেই প্রশ্নাকারে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

'রাত দশদণ্ডে চন্দনবিজয় যখন হ'ল।
তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছআড়ে।'

কি হ'ল তারপর?—

*'বুড়া লেংকা যাই বালি নবরে প্রবেশিল
রাজা আজ্ঞা ছামুয়ে একথা নিবেদিল।

টীকা: * বুড়ো লেংকা—হ'ল শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের একজন সেবাইত।

আজ্ঞা দিলে বিলোপিনো রাজা শ্রীঅঙ্গকু।
সমাধি করলি সর্বে নাম রতন ঘোষি।'

কবি বৈষ্ণবচরণ দাসের এই কথাগুলির পর শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে আর কি কোন সন্দেহের কারণ থাকে?'

'আচ্ছা প্রভু! শ্রীচৈতন্যদেব এক অনন্য পণ্ডিত, ধর্মজ্ঞ, সৎ-গুণের মহাজন, নির্লোভী, দেশহিতৈষী, অহিংস, নির্লিপ্ত প্রেমময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্মার্তদের দুর্ব্যবহার তাঁকে নবদ্বীপ ত্যাগ ক'রতে বাধ্য ক'রেছিল; আবার সেই স্মার্তদের বিরোধীতার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল পুরীতে এসেও। শ্রীক্ষেত্রে বহু রাজকর্মচারী, স্থানীয়মানুষ ও জগন্নাথের পাণ্ডারা তাঁর বিরোধী হ'য়ে উঠেছিল কেন?'—প্রশ্ন করলাম আমি।

শুনে হাসি-মুখে উত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ—'মহত্বের আদর্শ সহজে জনগম্য হয় না। আর সেই আদর্শ সহজে জনবোধগম্য হয় না বলেই বিরোধ আসে। কবি রবীন্দ্রনাথ তো ব'লেছেন মহাপুরুষ যখন আসেন তখন বিরোধ নিয়েই আসেন, নাহলে তাঁর আসার সার্থকতা নেই। ভেসে চলার দল মানুষের ভাটার স্রোতকেই মানে, যিনি উজিয়ে গিয়ে তরীকে ঘাটে পৌঁছে দেবেন তাঁর দুঃখের অন্ত নেই—স্রোতের প্রতিকূলতা তাঁর প্রত্যেক পদেই। মহাপুরুষ কখনওই সময়ের ভাটার স্রোতকে মেনে নেন না; সময়ের তিরস্কার অগ্রাহ্য ক'রে সময়কে নিজের অনুকূল ক'রে তুলতে চেষ্টা করেন ব'লেই আসে বিরোধ তাঁদের জীবনে। শুধু শ্রীচৈতন্য দেবের জীবনে নয়, প্রতিটি মহান ব্যক্তিত্ব যেমন কিছু মানুষের কাছে পূজ্যপাদ হ'য়ে উঠেন; আবার অন্যদিকে একদল মানুষ তাঁদের চরম বিরোধিতা করে—আমার বেলায়ও তাই হ'য়েছিল, হ'য়েছিল যীশুখৃষ্টের বেলায়, হজরত মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামকৃষ্ণের বেলায়ও। আসলে মহান

ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারা সমসাময়িক মানুষের বোধগম্য হয় না—তা সাধারণের বোধে আসতে অনেক সময় লাগে—প্রায় ৬০/৭০ বৎসর অতিক্রান্ত হ'য়ে যায়।

'আচ্ছা ঠাকুর! তুমি যে ব'ললে—"ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" মৃতেরও জন্ম নিশ্চিত। তাহ'লে মানুষের পুনর্জন্ম আছে?'—জিজ্ঞেস ক'রলাম আমি।

ভগবান ব'ললেন,—"আছেই তো পুনর্জন্ম। দেহীর দেহে পর পর কৌমার, যৌবন ও জরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে, তাতেও যেমন দেহীর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তেমনি মৃত্যুতেও দেহী থাকেন অবিকৃত।

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি··· ··· ···॥" গীঃ ২/১৩

মানুষ যেমন ছেঁড়া পরিধান ছেড়ে নূতন পরিধান পরে তেমনি, আত্মাও জীর্ণ দেহ পরিহার ক'রে নূতন দেহ পরিগ্রহণ করে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" গীঃ ২/২২

প্রশ্ন ক'রলাম—'মৃত্যুর পর মানুষ কে কি রকম লোক পায়?'

ভগবান ব'ললেন,—"মৃত্যুর পর মানুষের স্থুল-মৃতদেহের ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু তার সূক্ষ্মদেহে মানসিক শক্তির স্পন্দনে থেকে যায় প্রবৃত্তির সব ভাবগুলি, যার থেকে সে জন্মলগ্ন হ'তেই সৎ কিংবা অসৎ প্রবৃত্তি-পরায়ণ হ'য়ে উঠে। মানুষের কামনাই মানুষকে তার সঠিক

কামনামত পরিবেশে নিয়ে যায়; তাই তার ঐরূপ কামনা বাসনা যেখানে চরিতার্থ হবে, সেইরূপ পিতামাতার আশ্রয়েই জন্ম নেয় সে। মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি তাই ব'লছেন,—

"কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে অত্র যত্র।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ও ব'লছে—"স ঈয়তেঽমৃতো যত্র মামং।"

মরণকালে মানুষের মনে যে সব চিন্তা বা ভাবের উদয় হয় মানুষ পুনর্জন্মকালে সেই রকম লোক পায়—তাই প্রশ্নোপনিষদ্ ব'লছে—

"যচ্চিত্তঃ তেন এষ প্রাণম্ আয়াতি প্রাণঃ
তেজসাযুক্তঃ সহ আত্মন যথা সংকল্পিত লোকং নয়তি।"

মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাবে ভাবিত হয় সেই ভাবদেহ নিয়েই পুনর্জন্ম লাভ ক'রে থাকে।

দেবী ভাগবৎও ব'লছে—
"পূর্বদেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্মবশানুগঃ
স্বর্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি স্বকৃতেন বৈ।
ভুনক্তি বিবিধান্ ভোগান্ স্বর্গে বা নরকেঽথবা
ভোগান্তে চ যদোৎপত্তেঃ স ময়স্তস্য জায়তে।
তদৈব সঞ্চিতেভ্যশ্চ কর্মেভ্যঃ কর্মভিঃ পুণঃ
যো জয়ত্যেব তং কালঃ।"

মানুষ নিজের কর্ম্মানুসারে পূর্ব্বদেহ ত্যাগ ক'রে স্বর্গ বা নরক

লাভ করে। স্বর্গ বা নরক ভোগান্তে পুনর্জন্মের সময় কাল তাকে সঞ্চিত কর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করে। আমি অর্জ্জুনকে ব'লেছিলাম—

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥" ১৫/৮

বাতাস যেমন ফুল থেকে গন্ধ সংগ্রহ করে, ঠিক তেমনি মানুষ মরার পর পুনরায় দেহ গ্রহণ করার সময় তার মন ও ইন্দ্রিয়াদি সঙ্গে নিয়ে যায়।

মনুর বংশধর ঋষভদেবের পুত্র ভরত ছিলেন, অতি শক্তিশালী ও প্রজাবৎসল ধার্ম্মিক রাজা। পিতার উপদেশ মতো রাজকার্য পরিচালনার সাথে সাথে তিনি সদাসর্ব্বদা হরি-আরাধনায় তৎপর থাকতেন। ক্রমে ভগবৎ আরাধনা ও ভগবৎ জ্ঞানে তার মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তখন তিনি তার পাঁচজন যুবক পুত্রদের হাতে রাজত্ব ও শাসনভার তুলে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে, গণ্ডকী নদীর তীরে গণ্ডক পর্ব্বতের পুলহ আশ্রমে বসবাস ক'রতে থাকেন। সেখানে তিনি জপ, তপ, সমাধি প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হরিকৃপা-সিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন। একদিন গণ্ডকী নদীর তীরে, সুশোভিত প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে দেখলেন এক গর্ভবতী হরিণীকে জল পান ক'রতে। হঠাৎ অতি ভীষণ সিংহগর্জ্জনে জলপানরতা হরিণীটি লাফ দিয়ে পালাতে গিয়ে প'ড়ে গেলে তার গর্ভস্থ হরিণ-শাবকটি গর্ভচ্যুত হ'য়ে নদীর জলস্রোতে ভেসে যেতে দেখে দয়াদ্রচিত্ত রাজর্ষি ভরত তাড়াতাড়ি জলে নেমে স্বহস্তে নিলেন তুলে। শাবকটিকে এনে প'ড়ে থাকা হরিণীর কাছে দিতে গিয়ে দেখলেন, হরিণীটি মারা গেছে। তখন ঐ শাবকটিকে নিজ কোলে তুলে রাজর্ষি ভরত নিয়ে এলেন আশ্রমে। হরিণ শাবকটি ক্রমে রাজা কর্ত্তৃক লালিত পালিত হ'য়ে

বর্দ্ধিত হ'ল। রাজা ভরত সদা সর্ব্বদা সন্তর্পণে লালন পালন ক'রতে লাগলেন। একবার চোখের আড়াল হ'লেই রাজর্ষি ভরত হ'তেন বিষণ্ণ। নিজ পুত্র ও রাজত্ব ও রাজসুখে অনাসক্ত হ'য়ে সব ছেড়ে বনে এসে হয়েছিলেন সন্ন্যাসী—আশ্রমবাসী। কিন্তু কালক্রমে হরিণ শাবকের প্রতি আসক্তিতে এমন আসক্ত হ'য়ে প'ড়লেন যে, রাজার জপ, ধ্যান, মননের মধ্যেও হরিণের মুখটি ভেসে উঠতো। নিরাসক্ত রাজা ক্রমে হ'লেন হরিণাসক্ত। এইভাবে চলার পর দেহত্যাগ কালে রাজর্ষি ভরত দেখলেন, হরিণটি পুত্রবৎ ক্রন্দনরত। হরিণভাবে ভাবিত হ'য়ে রাজর্ষি ভরত দেহত্যাগ ক'রলেন। ফলে তার পুনর্জন্ম হ'য়েছিল হরিণশিশু হ'য়ে। তাহ'লে বুঝতে পারছো মানুষ মরণকালে যে ভাব বা চিন্তার বশবর্ত্তী হ'য়ে মারা যায়, পুনর্জন্মে সে সেই ভাবকেই আশ্রয় ক'রেই জন্মলাভ ক'রে থাকে।"

আমি প্রশ্ন করলাম—"তাহ'লে তো ঠাকুর তোমার কথা ভাবতে ভাবতে মারা গেলে মানুষ তো তোমাকে পেতে পারে। যার ফলে পুনর্জন্মের দুঃখ কষ্ট থাকবে না?"

শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন—"তাতো পারেই। আমি অর্জ্জুনকে ব'লেছিলাম—

অনন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতিনাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।" ৮/৫

যে ব্যক্তি মরণকালে আমাকে চিন্তা ক'রতে ক'রতে মারা যায়, সে আমাকে লাভ করে এতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রভু! তুমি ব'ললে—"জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যু" অর্থাৎ যে জন্মেছে তার মরণ নিশ্চিৎ। বর্ত্তমান যুগের মণীষা কবিও ব'লেছেন—

'জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর
হায়রে জীবন নদে।'

'একথা সত্য বটে, কিন্তু এই মৃত্যু কে? কোথা থেকেই বা তার উৎপত্তি? কেনই বা সে প্রাণীদের বিনাশ বা ধ্বংস করে?'—প্রশ্ন ক'রলাম আমি।

শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন,—"ব্রহ্মা সকল প্রজা সৃষ্টি ক'রলেন, কিন্তু কেউ বিনষ্ট হয় না দেখে তিনি চিন্তিত হলেন। ফলে তিনি হ'লেন ক্রোধান্বিত। তাঁর সেই ক্রোধ থেকে অগ্নি সমুত্থিত হ'য়ে এ বিশ্বের স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সকল প্রাণী ক্রমে বিনষ্ট হ'তে লাগল। তা দেখে ভগবান মহাদেব ব্রহ্মার শরণাপন্ন হ'য়ে ব'ললেন, "প্রভু! তুমি এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমার ক্রোধাগ্নিতে এ বিশ্ব দগ্ধ হ'য়ে ধ্বংস হ'তে চ'লেছে, এখন তুমি প্রসন্ন হ'য়ে এর একটা উপায় উদ্ভাবন কর।" শুনে ব্রহ্মা ব'ললেন,—"হে রুদ্র! এ জগতের কল্যাণের জন্য আমি ক্রোধান্বিত হ'য়ে প্রাণীদের সংহাব নিমিত্ত অগ্নির সৃষ্টি ক'রেছি।' মহাদেব ব'ললেন,—"হে জগন্নাথ! প্রসন্ন হ'য়ে তোমার ক্রোধ সংবরণ কর, তোমার সৃষ্ট সকল প্রাণীদের রক্ষার্থে তোমার তেজ সংহার কর, সকল প্রাণী যাতে জীবিত থাকে তার ব্যবস্থা কর। এ বিশ্বের বিনাশ ঘটিও না।" মহাদেবের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তাঁর ক্রোধাগ্নিকে সংহার ক'রলে, তার সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ হ'তে কৃষ্ণা, রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণা, রক্তজিহ্বা, রক্তবর্ণা, রক্তলোচনা ও নানা ভূষণে ভূষিতা এক নারীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হ'লেন। সেই নারী আবির্ভূতা হ'য়ে হাসতে হাসতে দক্ষিণ দিক আশ্রয় করলেন। তখন ব্রহ্মা সেই নারীকে মৃত্যু ব'লে "আহ্বান ক'রে ব'ললেন,—"তুমি আমার ক্রোধ

থেকে উৎপন্না হ'য়েছ, তুমি সমস্ত প্রজাগণকে যথাসময়ে বিনাশ কর।" এই কথা শুনে সেই মৃত্যু কাঁদতে কাঁদতে ব'ললেন,—"ভগবান! আপনি কেন আমাকে সৃষ্টি ক'রলেন? আমি কিভাবে এ পাপ কাজ ক'রব? আমি এ অধর্ম কাজ ক'রতে ভয় পাচ্ছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, মা, বাবা ও সন্তানকে বিনাশ ক'রলে তারা আমার অনিষ্ট চিন্তা ক'রবে ভেবে আমি ভীত ও চিন্তিত। আপনি আমাকে তপস্যা ক'রতে অনুমতি দিন। অধর্ম হ'তে রক্ষা ক'রে আমাকে বিপদমুক্ত করুন।" পুনরায় ব্রহ্মা তাকে তাঁর আদেশ পালন ক'রতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু মৃত্যু কিছুতেই ব্রহ্মার আজ্ঞা পালন ক'রতে চাইলেন না। ব্রহ্মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মৃত্যু ধেণুকাশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত হ'য়েছিলেন। বহু তীর্থে বসবাসের পর তিনি একাগ্রচিত্তে বহুবৎসর তপস্যা, উপাসনা ক'রে ব্রহ্মার প্রীতি লাভ করেন। স্বয়ং ব্রহ্মা তার কাছে উপস্থিত হ'য়ে তার ঐ কঠোর তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে মৃত্যু ব'ললেন, "ভগবান! প্রজারা সুস্থ হ'য়ে জীবন যাপন করে, আমি অন্যায়ভাবে তাদের বিনাশ ক'রতে পারব না, আমাকে অভয় প্রদান করুন।" তা শুনে ব্রহ্মা ব'ললেন,—"হে কন্যে মৃত্যু!

মা বিনশ্যেজ্জগন্নাথ জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
প্রসাদাভিমুখং দেবং তস্মাদেবং ব্রবীম্যহম্॥
উপসংহরতস্তস্য তমগ্নিং রোষজং তথা।
প্রাদুর্বভূব বিশ্বেভ্যো গোভ্যো নারী মহাত্মনঃ॥
ত্বং হি সংহারবুদ্ধ্যাথ প্রাদুর্ভূতা রূষো মম।
তস্মাৎ সংহর সর্ব্বংস্ত্বিং প্রজাঃ সজড়পণ্ডিতাঃ॥

প্রজা বিনষ্ট কারণে তোমার কোন অধর্ম হবে না, তুমি নির্ভয়ে প্রাণ সংহার কর, তোমার সনাতন ধর্ম লাভ হবে, আমার বাক্য,

নিষ্ফল হবে না। লোকপাল যম, দেবতাগণ ও ব্যাধি সকল তোমার এ কাজের সহায়ক হবে। আমি তোমাকে বর প্রদান করবো যে তুমি পাপমুক্ত হ'য়ে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জন ক'রতে পারবে।

লোকপালো যমশ্চৈব সহায়া ব্যাধয়শ্চ তে।
অহং চ বিবুধাশ্চৈব পুনর্দাস্যাম তে বরম্॥
যথা ত্বমেনসা মুক্তা বিরজাঃ খ্যাতিমেষ্যসি।

তখন মৃত্যু ব'ললেন,—যদি আমাকে ছাড়া আপনার এই কার্য্য সম্পাদিত না হয় তবে আমি বাধ্য হ'য়েই আপনার আজ্ঞা পালন ক'রব, কিন্তু আমার নিবেদন এই যে—

লোভঃ ক্রোধোঽভ্যসূয়ের্ষা দ্রোহো মোহশ্চ দেহিনাম্।
অহ্রীশ্চান্যোন্যপরুষা দেহান্ ভিন্দ্যুঃ পৃথক্ বিধাঃ॥

(লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, মোহ, দ্রোহ, নির্লজ্জতা প্রভৃতি রিপুসব প্রাণীদের দেহ ভেদ ক'রবে, তথা মৃত্যুর কারণ হবে।)

"উত্তরে ব্রহ্মা বললেন,—"তথাস্তু" অর্থাৎ হে মৃত্যু! তোমার কথামতই কাজ হবে, তুমি প্রাণী বিনাশে প্রবৃত্ত হও, আমি তোমাকে রক্ষা ক'রব। আমার করতলে তোমার যে চোখের জল প'ড়েছে তা ব্যাধিরূপে প্রাণীগণকে বিনাশ ক'রবে, তোমার কোন অধর্ম হবে না। তুমি প্রাণীগণের ধর্ম, ধর্মপরায়ণ ও ধর্মের কারণ, প্রাণীগণের ধর্ম-অধীশ্বরীও তুমি। তুমি কাম, ক্রোধ পরিহার ক'রে প্রাণীদের প্রাণ-সংহারে প্রবৃত্ত হও।" সেই থেকেই মৃত্যু নিঃসংকোচে প্রাণীদের প্রাণ সংহার করেন। প্রাণীরা জন্মে দেহ ধারণ ক'রে বেঁচে থাকছে, তারপর কালক্ষয়ে, কর্মক্ষয়ে দেহত্যাগ ক'রছে। এটা জানার বা জ্ঞানে আসার

নামই যমের ঘর চেনা, তথা মৃত্যুকে জানা।

ঋষি উদ্দালক তাঁর পুত্র আরুণীকে যমকে দান ক'রেছিলেন ; যমকে দান করা মানে বাক্যের মাধ্যমে যমের বাড়ী চিনিয়ে দেওয়া। জন্ম-মরণের গতিটাই হ'ল বাক্য। এ গতি মানে বোধ, এ গতি হ'ল অনুভূতি—যা সবসময় বাক্যের মাধ্যমে বাক্যকে আশ্রয় ক'রে ফুটে উঠছে একপাশে অগ্নিত্ব অপর পাশে সূর্য্যত্ব ও মাঝে সোমত্ব হ'য়ে। বাক্যের অগ্নিত্ব হ'ল জ্বলে ওঠা ও নিভে যাওয়া, সোমত্ব হ'ল প্রাণ দেওয়া ও নিয়ে নেওয়া, সূর্য্যত্ব হ'ল আঁধারভূত হওয়া বা প্রকাশ করা ও অপ্রকাশ করা।

মৃত্যু কি? এবং কেন? মানুষের কাছে এটাই সংশয়। ঋষিপুত্র আরুণী মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'য়েছিলেন ব'লেই তাকে বলা হ'ত নচিকেতা। নচিকেতা মানে সংশয়হীন পুরুষ। তার যমের বাড়ী যাওয়ার অর্থ হল মৃত্যুতত্ত্ব শেখা।

আসলে কি জান! মানুষ তার নিজ দোষে বা কর্মফলেই মৃত্যুকে বরণ ক'রে থাকে।'

'সেটা কি রকম?'—জিজ্ঞেস করলাম আমি।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "পুরাকালের গৌতম নামে এক প্রজ্ঞাবান ব্রাহ্মণের গল্প বলছি শোন, তাহ'লেই 'একথা' তোমার ধারণায় আসবে।

ঐ ব্রাহ্মণের একটি মাত্র বালক পুত্র সন্তান ছিল। একদিন এক সাপ ব্রাহ্মণের ঐ বালক পুত্রটিকে কামড় দিলে, ঐ বালকটির মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মণের অর্জ্জুন নামে এক হিতৈষী ব্যাধ ছিল, সে সাপের কামড়ে ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যু হ'য়েছে জেনে ক্রুদ্ধ হ'য়ে, ঐ সাপটি বেঁধে ব্রাহ্মণের কাছে নিয়ে উপস্থিত হ'য়ে সাপটিকে বধ করতে ইচ্ছা প্রকাশ ক'রলে ; ব্রাহ্মণ সেই ব্যাধকে নিষেধ ক'রে বলেছিলেন যে সাপকে মারলে তার পুত্রের প্রাণ ফিরে আসবে না। তার পুত্রের কর্মফলের

জন্যই সাপ তাকে কামড়েছে। তার পুত্রের আয়ু শেষ হ'য়েছে তাই মৃত্যুর দ্বারা অদিষ্ট হ'য়ে এ সাপ তাকে কামড়েছে, তাতে সাপের কোন দোষ নেই। অতএব ব্যাধের সাপকে ক্ষমা ক'রে ছেড়ে দেওয়া উচিত। মানুষের মৃত্যু তার নিজের কর্মফলের অধীন—সাপ নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু ব্যাধ কিছুতেই সাপকে ছাড়তে চাইল না। সে বলল, এইসাপ আরো অনেকের মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে, অতএব একে বিনাশ করাই কর্তব্য। সাপ তখন ব্যাধকে বলল যে তার কোন দোষ নেই, সে স্বইচ্ছায় ব্রাহ্মণের ঐ বালক পুত্রকে কামড়ায় নাই ; সে পরাধীন। মৃত্যুই তাকে পাঠিয়েছিল বালকটিকে কামড়াতে। ব্যাধ বলল সাপকে যে, মৃত্যু এর মুখ্য কারণ হ'লেও সাপ ওকে কামড়ানর জন্যই ও মারা গেছে অতএব সাপ বধের যোগ্য। তখন মৃত্যু সেখানে এসে বলল যে, সে এজন্য দায়ী নয় ; কারণ কাল কতৃক আদিষ্ট হ'য়ে সে সাপকেপাঠিয়েছিল বালকটিকে কামড়ানর জন্য। কালের অধীন সবাই। কালই সবাইকে সংহার করান। সাপ কিংবা সে কেউ দোষী নয়। কালের দোষ গুণ বিচার করা তাদের কর্তব্য নয়। ব্যাধ ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলেছিল যে সে মৃত্যু ও সাপ দুইজনকেই বিনাশ করবে। এমন সময় সেখানে কাল এসে উপস্থিত হ'য়ে বলেছিল ব্যাধকে যে সে, মৃত্যু ও সাপ কেউই এই বালকের বিনাশের জন্য দায়ী নয়। বালকের পূর্বজন্মে অর্জ্জিত কর্ম্মফলই তার বিনাশের আসল কারণ। কর্ম্মই মানুষের পূর্ব্বজন্ম ফল দান করে। মানুষ সদাসর্ব্বদা কর্ম্মের অধীন। কর্ম্মই মানুষকে যথাযথ ফল দান ক'রে থাকে।

'ন হ্যহং নাণ্যয়ং মৃত্যুর্ণায়ং লুব্ধক পন্নগঃ।
কিল্বিষী জন্তমরণে ন বয়ং হি প্রয়োজকাঃ ॥
অকরোদ্ যদয়ং কর্ম্ম তন্নোঽর্জুনক চোদকম্।
বিনাশহেতুনান্যোঽস্য বধ্যতেঽয়ং স্বকর্ম্মণা ॥

যদনেন কৃতং কর্ম্ম তেনায়ং নিধনং গতঃ।
বিনাশহেতুঃ কর্ম্মাস্য সর্বে কর্ম্মবশা বয়ম্ ॥'

'প্রভু! মানুষ ত্রিলোক জয় ক'রে স্বর্গসুখ লাভ ক'রতে পারে কি ক'রে?' প্রশ্ন ক'রলাম আমি।

ভগবান ব'ললেন,—'মানুষ স্থিতপ্রজ্ঞ কিংবা স্ববোধে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রলে অক্ষয় স্বর্গসুখ লাভ ক'রতে পারে। তিন অগ্নি অর্থাৎ আহবণীয় অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি ও গাহর্পত্য অগ্নিকে একত্রীকরণ ক'রলেই, মানুষ স্ববোধে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রতে পারে। যম নচিকেতাকে এই তিন অগ্নি একত্রীকরণের উপদেশ দিয়েছিলেন এবং নচিকেতাও এই তিন অগ্নি একত্রীকরণ ক'রে অক্ষয় স্বর্গলাভ ক'রেছিলেন ব'লেই, নচিকেতার নাম হ'য়েছিল ত্রিনাচিকেতাগ্নি। পৃথিবীর আগুনকে পৃথিব্যাগ্নি তথা আহ্বনীয় অগ্নি, চন্দ্রের অগ্নিকে সোমাগ্নি তথা দক্ষিণাগ্নি ও সূর্য্যের অগ্নিকে সূর্য্যাগ্নি তথা গার্হপত্য অগ্নি বলে। আহ্বনীয় অগ্নি হ'ল বাক্, দক্ষিণাগ্নি হ'ল প্রাণ ও গার্হপত্য অগ্নি হ'ল মন। বাক্, প্রাণ ও মনের একত্রীকরণেই প্রতিষ্ঠা হয় স্ববোধের।'

'প্রভু! গৃহী সংসারবদ্ধ মানুষের পক্ষে ঐ তিন অগ্নির একত্রীকরণের সহজ উপায় কি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ভগবান ব'ললেন,—'বহু পথ আছে কিন্তু সবচেয়ে সহজ ও সরল পথ হ'ল পিতা, মাতা ও গুরুর যথাযথ সেবা করা। সঠিকভাবে পিতা, মাতা ও গুরুর সেবা ক'রতে পারলে মানুষ ত্রিলোক জয় ক'রে ইহলোকে মহিয়সী কীর্ত্তি ও পরলোকে দিব্যধাম লাভ ক'রে থাকে। তাঁদের দেওয়া উপদেশ, আদেশ সঠিক কি বেঠিক বিবেচনা না ক'রে বিনা দ্বিধায় সাগ্রহে পালন করাই ধর্ম্ম। তাঁরা মানুষের জীবনে ত্রিলোক, তিন আশ্রয়, তিন বেদ ও তিন অগ্নিস্বরূপ। পিতা হ'লেন গার্হপত্য অগ্নি, মাতা হলেন দক্ষিণাগ্নি ও গুরু হ'লেন আহ্বনীয়াগ্নি।

যথাবিধি নিয়মিতভাবে পিতৃসেবায় ইহলোক, মাতৃসেবায় পরলোক ও গুরুসেবায় ব্রহ্মলোক বিজয় হয়।

"এত এব ত্রয়ো লোকা এত এবাশ্রমাস্ত্রয়ঃ।
এত এব ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥
পিতা বৈ গার্হপত্যোঽগ্নির্মাতাঽগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাঽগ্নিত্রেতা গরীয়সী॥
ত্রিষপ্রমাত্মন্নেতেষু ত্রীল্লোঁকাংশ্চ বিজেষ্টসি।
পিতৃবৃত্ত্যা ত্বিমং লোকং মাতৃবৃত্ত্যাতথাঽপরম্॥
ব্রহ্মলোকং গুরোর্বৃত্ত্যা নিয়মেন তরিষ্টসি।"

পিতা প্রীত হ'লে প্রজাপতি, মাতা প্রীত হ'লে বসুমতী আর গুরু প্রীত হ'লে ব্রহ্ম প্রীত হন। পিতা, মাতা অপেক্ষা গুরু পূজ্যতম।

জীবভাবের সাধন সংশয় ও আত্মভাবের সমাধান দিতে গিয়ে শ্রীগীতায় ধৃতরাষ্ট্রের একটি প্রশ্নের উত্তরে মহামতি সঞ্জয় সাতষট্টি শ্লোক, অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও স্তুতিতে সাতান্নটি ও তার সমাধান দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে ছয়শত কুড়িটি শ্লোকের অর্থাৎ ১+৬৭+৫৭+৬২০=৭৪৫টি শ্লোক নিয়ে শ্রীগীতার অবতারণা করেছিলেন ঋষি ব্যাসদেব, যা আমরা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের ৪৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে দেখতে পাই—

"ষট্ শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ।
অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং চ সঞ্জয়ঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়াঃ মানমুচ্যতে॥"

বিঃ দ্রঃ—যারা গুরু, পিতা ও মাতার অনিষ্ট চিন্তা করে, তাদের চেয়ে পাপাত্মা এ সংসারে নেই। পিতা-মাতা হ'তে যে দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু গুরু যা উপদেশ দেন তা অবিনাশী—কোন কালেই তা ক্ষয় হয় না।

কিন্তু কালক্রমে চলিত প্রথা অনুসারে তা ৭০০ শ্লোকে এসে দাঁড়িয়েছে ; যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র মুখে একটি, সঞ্জয় মুখে পঁয়তাল্লিশটি, অর্জ্জুন মুখে একাশিটি ও শ্রীকৃষ্ণ মুখে পাঁচশত তিয়াত্তরটি শ্লোক।

শ্রীগীতা সম্বন্ধে মানুষের মনে একটি ব্যাপারে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা যায় তা হ'ল, গীতা কবি-কল্পিত যোগশাস্ত্র, না—ঐতিহাসিক ঘটনা প্রসূত ?

শ্রীগীতা কবি কল্পিত কাব্য নয়—এ হ'ল এই ভারতে এক ঐতিহাসিক ঘটমান ঘটিত ঘটনা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মুখ-নিঃসৃত বাণী। আবার যোগশাস্ত্রও বটে। কথা শুনে মনে হ'তে পারে যে, শ্যামও রইল অথচ কুলও রক্ষা হ'লর মতো ব্যাখ্যা। আসলে তা নয়, গীতা ঐতিহাসিক সত্য কাহিনী। এ জগতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের মধ্যে এক অদৃশ্য নিবিড় শৃঙ্খলা ভগবৎ ইচ্ছানুসারে রচিত হ'য়ে ক্রম চলমান র'য়েছে। যার ফলে ভৌতিক রাজ্যের সমস্ত ঘটনাই চৈতন্যক্ষেত্রে তথা অন্তঃরাজ্যে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিম্বিত হ'তে দেখা যায়। স্থূল জগতের ঘটনার প্রতিচ্ছবি আন্তঃ তথা সূক্ষ্ম জগতে প্রতিভাত হয়।

মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ২৫ অধ্যায় থেকে ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত মহর্ষি ব্যাসদেব গীতারূপে প্রকাশ করেছেন। আগেই বলেছি ব্যাসঋষি শ্রীগীতাকে তিনভাবে অর্থাৎ অধিভৌতিক, অধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকভাবে দেখেছেন।

অগ্নি বলতে মানুষ বোঝে সাধারণত চোখের সামনে জড় অগ্নি। 'ঋষয় মন্ত্রদ্রষ্টায়'—ঋষিরা হ'লেন মন্ত্রের দ্রষ্টা। মন্ত্রদ্রষ্টা মানে কি ? আমি যেমন স্বচক্ষে তোমাদের দেখছি—তোমরা যেমন আমাকে স্বচক্ষে দেখছ, ঠিক সেইভাবেই ঋষিরা দেখেছেন মন্ত্র সমূহকে। মন্ত্র মাত্রেই দেবতাত্মক। দেবতা অর্থে দ্যুতিমান বস্তু তথা জ্যোতির্ম্ময়। প্রত্যেক দেবতার মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি বর্ত্তমান।

'অগ্নির্জ্যোতি—জ্যোতিঅগ্নি'

ঋষিরা ভৌতিক অগ্নিকে যেমন জড় অগ্নি বলেন, তেমনি আন্তঃ শরীরে দিব্যজ্যোতিকে ব'লতেন অগ্নি। এই দিব্যজ্যোতি সব প্রাণীদের মধ্যেই ঘুমন্ত বা সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান র'য়েছে। প্রজ্ঞাবান ঋষিরা ঐ দিব্যজ্যোতিকে জাগ্রত বা নিজ অন্তরাকাশে প্রজ্জ্বলিত ক'রে হোমক্রিয়া সম্পাদন ক'রতেন। তাঁরা তাঁদের 'আমি' ও 'আমার' যা কিছু আছে সবই ঐ দিব্যজ্যোতিতে অর্পণ ক'রে তাঁদের —আমার আমিত্ব-স্বামীত্ব-প্রভুত্ব ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদন ক'রে, ঐ দিব্যজ্যোতিকে অন্তরাকাশে দেখতে পেতেন স্পষ্টভাবেই; যেমন ভাবে আমি তোমাদের দেখছি বা তোমরা আমাকে দেখছো। এই দিব্যজ্যোতি অন্তরাকাশে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আকাশের মতো নিজেদের মধ্যে সর্ব্বব্যাপক ভাব অনুভব করতেন। এই দিব্যজ্যোতি তাদের অসীম সত্তায় উন্নীত করতো। এই অগ্নির—কৃপায় তাঁরা নিজেদের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ ক'রে অমৃতত্ব লাভ ক'রতেন। অমৃতত্ব লাভের অর্থ কিন্তু না মরা নয়। এ জগতে জন্মগ্রহণ ক'রে এ দেহ যখন লাভ হ'য়েছে, তখন দেহের ক্ষয় বা বিনাশ ঘটবেই। অমৃত=অম্+ঋত্; 'অম্' মানে অপ্রকাশিতের তথা ভগবৎ সত্তার তথা ভগবানের, আবার ঋত্ মানে প্রকাশ। অর্থাৎ অপ্রকাশিতের প্রকাশ তথা ভগবৎ সত্তার আবির্ভাব। অমৃতত্ব লাভ হয় অর্থাৎ নিজ সত্তায় ভগবৎ সত্তার বিকাশ ঘ'টে ভগবান হ'য়ে যাওয়া।

অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের প্রকাশ। অগ্নির এই কাজগুলি চোখ চেয়ে বা বুঝে দেখতে পেতেন যাঁরা তাঁরাই হ'লেন ঋষি তথা সত্যের আবিষ্কারক—বিজ্ঞানী বা Scientists.

আর যাঁরা দিব্যদৃষ্টিতে প্রজ্ঞাবান ঋষিদের মতো স্পষ্ট দেখতে

পেতেন না, অথচ সুবুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্যে পুনঃপুন সঠিক বিচার মনন-ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা ঋষিদের দৃষ্ট সত্যকে স্ব স্ব হৃদয়ে অনুভব ক'রে জীবনে প্রয়োগ করতেন, তাঁদের বলা হ'তো মুনি তথা প্রযুক্তি-বিদ্—ইঞ্জিনীয়ার। বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এর উল্লেখ মেলে।

অধিভৌতিক, অধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন ভাবে যজ্ঞ বা দেবকর্ম্ম সম্পাদিত হ'তো তা সাধারণের বোধগম্যের জন্য একটি যজ্ঞকর্ম্মের বিধি ব্যক্ত করা যাক। পুরাকালে আমাদের দেশের রাজারা তাদের কৃত বিভিন্ন পাপ থেকে নিষ্পাপ হয়ে মোক্ষ লাভ করার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন ক'রতেন। যজ্ঞস্থলে এসে পুরোহিতরা কাঠে কাঠে ঘর্ষণ ক'রে আগুন জ্বেলে সেই আগুনকে সাক্ষী রেখে রাজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত ক'রতেন ও যথাবিধি সুচিহ্নিত অশ্বকে মন্ত্রপূত ক'রে তার কপালে বিজয়পত্র বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হ'তো। বিজয়পত্রে লিখে দেওয়া হ'তো—'আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রছি। আমার এই অশ্ব যে যে দেশ অতিক্রম ক'রবে সেই সেই দেশের রাজারা আমার অধীনস্থ হবে। যার ক্ষমতা থাকবে সে আমার এই অশ্বের গতি রোধ করুক।' ইতি রাজা ও রাজ্যের নাম। অশ্ব তার ইচ্ছামতো যে দিকে খুসী চলতে থাকতো, আর পিছনে চ'লতো রাজার সেনাপতি ও সৈন্য-সামন্তরা। যদি কোন রাজা তার রাজত্বের মধ্যে পেয়ে অশ্বকে ধ'রে রাখতো, তাহ'লে বাধতো যুদ্ধ—অশ্বের পিছনে থাকা সেনাপতি ও সৈন্যদের সঙ্গে। সেই রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে অশ্বকে দিতেন মুক্ত ক'রে যজ্ঞস্থলে ফিরে আসতো মন্ত্রপূত অশ্ব। তখন পুরোহিতরা অশ্বকে স্নান-সংকল্পাদি দ্বারা মন্ত্রসহযোগে সংস্কার মুক্ত ক'রে যজ্ঞস্থলে বলি দিতেন এবং তার মেদ মন্ত্রপাঠ সহযোগে অগ্নিতে আহুতি দিতেন। বহু নিমন্ত্রিত অতিথি, রাজণ্যবর্গ, ব্রাহ্মণভোজনের জন্য বহু পশু হ'তো বলি প্রদত্ত। যজ্ঞের অন্যান্য আনুসঙ্গিক ক্রিয়া-কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে হ'তো অশ্বমেধ

যজ্ঞ সম্পন্ন।

এই অশ্বমেধ যজ্ঞকে বলা হয় অধিভৌতিক অশ্বমেধ যজ্ঞ। আধ্যাত্মিক অশ্বমেধ যজ্ঞে পশু, অশ্ব বধ ক'রে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় না। এ যজ্ঞ হ'লো সম্পূর্ণ মানসিক ক্রিয়া কর্ম্ম। অশ্ব কথাটা এসেছে অশ্ ধাতু থেকে। 'অশ্' মানে ব্যাপ্তি বা গতি বা অগ্নি। অন্তরে যে দিব্যজ্যোতি ঋষিরা যৌগিক ক্রিয়া কর্ম্মের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করতেন, তাকে অশ্ব বলা হয়। সেই জ্যোতিকে বিশুদ্ধ ভাষায় অর্ক বলা হয়। অশ্বমেধ আন্তঃযজ্ঞের উপযোগী অর্ক মানে অগ্নি বা দিব্যজ্যোতি সার্বিক অন্তরাহুতির বলে যজ্ঞকারী মৃত্যুর কবল থেকে অমৃতত্ব লাভ ক'রতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযোগী এই অর্ক অগ্নি সম্বন্ধে ব'লতে গিয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ব'লেছে—

তমনোঽকুরুত আত্মস্বী স্যামিতি।
সোঽর্চ্চন্নচবৎ তস্য অর্চ্চতঃ আপঃ অজায়ন্ত।
অর্কতে বৈ মে কম্ অভূৎ ইতি।
তদেব অর্কস্য অর্কত্বং।
কং হ বা অস্মৈ ভবতি ব এবম এতৎ অর্কস্য অর্কত্বং বেদ।

প্রায় সব মানুষেরই বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানা আছে যে, পৃথিবীর যে অংশের মাটির তলায় যা নিহিত থাকে, ঠিক তার উপরিভাগের বৃক্ষ-লতাদির পাতার মধ্যে সেই মৌলের আভাস পরিলক্ষিত হয়। মাটির তলায় যেখানে স্বর্ণখনি আছে, তার উপরিপৃষ্ঠের গাছপালা, লতাপাতাদিতেও স্বর্ণ-মৌলের আভাস মেলে, যেখানে বিষ বা আর্সেনিক আছে তার উপরিভাগের বৃক্ষ-লতাপাতাদিতেও ঐ বিষ বা আর্সেনিকের আভাস পাওয়া যায়। এটা যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তাহ'লে অধিভৌতিক সকল ঘটমান ঘটনার প্রতিবিম্বের প্রতিফলন আমাদের মধ্যে প'ড়বে না কি? নিশ্চয় প'ড়বে, কারণ আমাদের

জন্ম যে এ পৃথিবীতে। তাই শ্রীগীতার এই স্থূল ঘটনা, সূক্ষ্ম ঘটনা হ'য়ে অন্তর্মুখী মনকে প্রভাবিত করেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে বাস্তব ভৌতিক ঘটনাসমূহ আধ্যাত্মিকভাবে পরিপুষ্ট হ'য়ে সাধককে শ্রীগীতার এক একটি অধ্যায় এক একটি সাধনক্রমের শিক্ষাদান করে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি নানান ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাদান ও তাকে বিশ্বরূপ দর্শন করান সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভেবে অনেকেই বলেন যে, শ্রীগীতা বাস্তব ভৌতিক ঘটনা নয়—এ হ'ল জীবন যুদ্ধে জয়লাভের জন্য আত্মিকভাবের ব্যঞ্জনা তথা আধ্যাত্মিক চেতনা-বিকাশের বিশেষ এক যৌগিক ক্রম। তা না হ'লে এ ঘটনা আমাদের প্রচলিত কথা তথা 'ধান ভানতে শিবের গীত' হ'য়ে দাঁড়ায় না কি? কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে এসে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি চাই শারীরিক ও মানসিক ভাবে, চাই একাগ্রতা ও মনের ঐকান্তিকতা। সেখানে শ্রীকৃষ্ণমুরলী ধ্বনি-অমৃত ধর্ম্মতত্ব শোনার সময় কোথায়? তাহ'লে এখানে কি বিশ্বরূপ-দর্শন অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ে নাকি?

উত্তরে বলা যায় ভৌতবিজ্ঞানে Atomic Energy আবিষ্কারের ফলে কোন বিজ্ঞানী তাকে ভাল কাজে কিংবা মন্দ কাজে ব্যবহার ক'রতে পারেন তার নিজস্ব ইচ্ছানুসারে। পারেন কেন বলি, বরং বলা ভাল এর অপব্যবহার করার দরুনই তো হিরোসিমা-নাগাসাকি আজও মানুষের কাছে এক বিভীষিকা। এই জন্য বিদ্যা বা ক্ষমতা শুধু অধিকার ক'রলেই চ'লবে না, তার সাথে সাথে চাই মনুষ্যত্বের বিকাশও—না হ'লে এ পৃথিবীতে অধিভৌতিক সৃষ্টির অমৃত-আস্বাদন ভুলে ধ্বংসের তাণ্ডব লোলুপতা বৃদ্ধি পেয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে—হয় আজ, না হয় আগামীকাল।

বিদ্যা বা শিক্ষা অধিকারীভেদে মানুষকে যেমন একদিকে বিনয়ী,

নম্র, শ্রদ্ধাবান, বোধি বা দেবতা ক'রে তোলে ; অপরদিকে কাউকে কাউকে আবার উদ্ধতপূর্ণ, ক্রুর, হিংস্র, প্রতিশোধ পবায়ণ দানব ক'রে তোলে। অধিকারীভেদে ক্ষমতার যে প্রয়োগ কি পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়ায় তা দেখতে বহু দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, এই পরাধীন কিংবা স্বাধীন ভারতের শাসকবর্গের দিকে লক্ষ্য ক'রলে সহজেই অনুমিত হবে আশা করি। হিন্দু রাজাদের রাজত্বকালে সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, অজাতশত্রুর ও শশাঙ্কের মধ্যে, মুসলমান নবাব বা সম্রাট নাদিরশাহ, চেঙ্গিস খাঁ, শেরশাহ ও আকবরের মধ্যে, ইংরাজ আমলে লর্ড বেন্টিক ও লর্ড কার্জনের কার্য্যকলাপের মধ্যে এবং স্বাধীন ভারতের শাসকশ্রেণীর কীর্ত্তিকলাপের কথা তো নূতন ক'রে বলার অপেক্ষা রাখে না।

মহাভারত গ্রন্থকে কেবলমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ, ইলিয়াড ওডিসির মতো বীরগাথার কাহিনী কিংবা বংশ পরম্পরার ইতিবৃত্ত ব'লে ভাবলে চ'লবে না। মহাভারত হ'ল—ভারত চেতনার মূল-মন্ত্র ; সকল ভারতবাসীর সামগ্রিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রিক চেতনার হৃদস্পন্দন। মহাভারতের যুগে সামাজিক ও নৈতিক চেতনা এমন ছিল যে অনধিকারীর হাতে বিদ্যা বা ক্ষমতা তুলে দেওয়া হ'তো না। এমন কি কেউ নিজ যোগ্যতা, ক্ষমতা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ে বিদ্যা বা ক্ষমতা অধিগত ক'রলেও তাকে যে কোন ভাবে হোক নিরস্ত্র করার বিধি প্রচলিত ছিল। তখনকার সমাজপতি আচার্য্যেরা কিংবা শিক্ষা গুরুরা সামাজিক দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন ব'লেই কখনও বা কোন অবস্থাতেই অনধিকারীর হাতে বিদ্যা তথা ক্ষমতা তুলে দিতেন না—সমাজের সার্ব্বিক কল্যাণের কথা ভেবে ; পাছে অনধিকারীর হাতে প'ড়ে বিদ্যা তথা ক্ষমতা সমাজ-জীবনে অমঙ্গল এনে দেয়।

সে যুগে নিজ নিষ্ঠায়, একাগ্রতায় অধ্যাবসায় ও চেষ্টায় ধনুর্বিদ্যায়

বিশেষ পারদর্শী হ'য়ে উঠেছিলেন নিষাদকুমার একলব্য দ্রোণাচার্য্যকে গুরুরূপে স্মরণ ও মনে গ্রহণ ক'রে, তাঁর মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত ক'রে সামনে রেখে। তা দেখে ও নিষাদকুমার একলব্যকে দেখে তার কর্ম্মসংস্কার ও মানসিক প্রস্তুতি লক্ষ্য ক'রে ব্যথিত হৃদয়ে দ্রোণাচার্য্য বৃদ্ধাঙ্গুলি গুরুদক্ষিণারূপে গ্রহণ ক'রেছিলেন একলব্যকে অনধিকারী ভেবে।

কর্ত্তব্য যতই কঠিন ও মর্মদায়ী হোক না কেন তা করণীয় বা পালনীয়। এ ঘটনা মহাভারত ও মহামতি দ্রোণকে পক্ষপাতিত্ব, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিপত্তি কিংবা জাত্যাভিমান দোষে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে না। কারণ সমাজের কল্যাণার্থে, হিতার্থে এই কাজ তাঁকে ক'রতে হ'য়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন এ বিদ্যা একলব্যকে সৎ ও নিষ্ঠাবানের মত প্রজাকল্যাণে অর্জুনের মতো ব্রতী করতে পারবে না, বরং তা সমাজের অকল্যাণ করবে। যিনি গুরু তার সমাজের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে যথেষ্ট। তিনি সব সময়ে সমাজের কল্যাণেই তাঁর বিদ্যাকে তথা ক্ষমতাকে প্রদান ক'রতে চান। সেই জন্যই মহামতি দ্রোণাচার্য্য চেয়েছিলেন এ পৃথিবী ভোগ্য হ'য়ে উঠুক পূর্ণ মনুষ্যত্বের, তাহ'লে মিথ্যা, কু-আচার, ব্যভিচার ও অত্যাচার প্রভৃতি অধর্ম্মের হবে অবসান; সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হ'য়ে সদা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শান্তি ও আনন্দ বিরাজ ক'রবে। ধর্ম্ম তো মানুষের জন্য, মানুষের দ্বারা, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। প্রতিটি জনকল্যাণমুখী সংগ্রাম হ'ল তার অঙ্গ বিশেষ।

যুদ্ধকর্তা, সঠিক অধিকারী, বিজ্ঞানী তথা অর্জ্জুন যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে ক্ষমতা বা তার অধিকার অধিগত ক'রে বিপথে তথা সমাজের অকল্যাণে না গিয়ে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী রূপে মানুষকে মনুষ্যত্বের অধিকার দান ক'রতে সাহায্য করেন তার জন্যই স্বয়ং ভগবান* শ্রীকৃষ্ণ

টীকা: * কৃষ ধাতু থেকে কৃষ্ণ শব্দের উৎপত্তি হ'য়েছে; কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা। ভক্তি মার্গে ভগবানের যে শক্তি জীবকে সদা সর্ব্বদা অনন্ত

নিজে যোগস্থ হ'য়ে ও অর্জ্জুনকে যোগস্থ ক'রে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই মুহূর্ত্তের মধ্যে—অর্জ্জুনকে কেন যুদ্ধ ক'রতে হ'চ্ছে, কিভাবে যুদ্ধ ক'রতে হবে সমস্ত কিছুই শিক্ষাদান ক'রেছিলেন। যোগস্থ অবস্থায় ঐ সমস্ত ঘটনা এক পলকের মধ্যেই ঘটে থাকে। নিশ্চয়ই কারুর অজানা নেই যে মানুষ স্বপ্নে সাতশত দিনের ঘটনা সাত মিনিটে দেখে থাকে। অতএব যোগস্থ অবস্থায় শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণে কালক্ষেপও অপ্রাসঙ্গিক দোষে দুষ্ট নয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্‌কালে রণস্থলে দাঁড়িয়েই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগস্থ অবস্থায় যে ব্রহ্মবিদ্যাসূচক জ্ঞান দান ক'রেছিলেন, তা তিনি নিজেই অর্জ্জুনকে বলেছেন।

পিতৃরাজ্য জয় করার পর ইন্দ্রপ্রস্থে একদিন বিচরণকালে এক রমণীয় স্থানে উপস্থিত হ'য়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন,—"বাসুদেব! কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকালে আপনি আমাকে যেসব ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন তা আমি ভুলে গেছি, আপনিও অতি শীঘ্রই দ্বারকায় ফিরে যাবেন। অতএব আমাকে সেই সব উপদেশ পুনরায় প্রদান করুন।"

এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন,—"অর্জ্জুন! তুমি শ্রদ্ধা-শূন্য ও বুদ্ধির দোষবশত ঐ সকল উপদেশ ভুলে গেছ। যুদ্ধকালে যোগস্থ হ'য়ে আমি তোমাকে ঐ সকল উপদেশ দিয়েছিলাম, এখন তো আবার তা আমার পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে এক সিদ্ধ

উন্নতির পথে, পূর্ণ মঙ্গলের পথে ও আনন্দের পথে আকর্ষণ করে—তাহাই শ্রীকৃষ্ণ।

কঠোপনিষদ্ বলছে—অথবা কর্ষয়েৎ সর্ব্বজগৎ স্থাবর জঙ্গমং
কালরূপেন ভগবাণ তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যতে।

(কালরূপ ভগবান সমস্ত জগতকে কর্ষণ করে, তাই নাম তার কৃষ্ণ। আরো ব'লেছে—'ঈশানং ভূতভাব্যস্য'—অতীত ও ভবিষ্যতের ঈশ্বর, কালের অতীত তিনি।)

ব্রাহ্মণ মহাত্মা কাশ্যপকে যা যা উপদেশ দিয়েছিলেন তা বর্ণনা ক'রছি শোন।" যার উল্লেখ মেলে মহাভারতের অশ্বমেধিক পর্ব্বের অনুগীতায়।

এই অধিকারীর কথা ব'লতে ব'লতে একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। ১৪০১ সালের (বাং) শেষের দিকে 'রমণী বেদপাঠে অধিকারিণী নয়'—শঙ্করাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজীর মন্তব্যে ঝড় উঠেছিল দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে। ক্ষেপে উঠেছিলেন সব নারী-সমাজ ও নারী সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। তাদের দিক্ থেকে এলো নানা প্রতিবাদ। আসবেই তো, সমাজের পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে না? সাথে সাথে নারী মনেরও তো পরিবর্দ্ধন হ'চ্ছে। শুধু তাই না, আগে রাজারাই ছিলেন ধর্ম্মের পালক। আমাদের দেশে এখন রাজা নেই; গণতন্ত্র ব'লে সরকারই করেন দেশ শাসন। সেই সরকারই দিয়েছেন নারী-পুরুষের সমান অধিকার, তাহ'লে সেই অধিকার খর্ব হ'তে দেবেন কেন তারা?

এখন একটা প্রশ্ন হ'চ্ছে—অধিকারী ভেদে অধিকার না—অধিকার ভেদে অধিকারী? আসলে অধিকার ভেদেই অধিকারী হয়। সম্পত্তিতে যদি তোমার অধিকার থাকে, তবেই তো তুমি ঐ সম্পত্তির অধিকারী। একের অধিকার অন্যের কাঁধে দিলে অনর্থ বাধার সম্ভাবনা প্রবল থাকে, কিন্তু অন্যের অধিকার ভুলেও অস্বীকার ক'রতে নেই কখনও। এখন দেখা যাক, আমাদের প্রজ্ঞাবান ঋষিরা, অবতার পুরুষরা কিংবা শাস্ত্র রমণীদের বেদ বা বৈদিক গ্রন্থপাঠে অধিকার দান ক'রে তাদের অধিকারিণী ক'রেছেন কিনা?

গোভিলীয় গুহ্যসূত্রে দেখা যায়, —

'পুরাকালে কুমারীণাং মৌঞ্জিবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা।।'

পুরাকালে, কুমারীদের মৌঞ্জীবন্ধন ও উপনয়ন ক'রে বেদ অধ্যয়ন ও গায়ত্রী উপদেশ দেওয়া হ'তো।

সূর্য্যসংহিতাও ব'লছে—যে দ্বিজ রমণীদের বৈদিক গ্রন্থ পাঠ ক'রে জ্ঞানলাভের অধিকার আছে।

'দ্বিজস্ত্রীণামাপি শ্রৌতজ্ঞানভ্যাসেঽধিকারিতা।'

'দ্বিজস্ত্রী' ব'লতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য রমণীগণকে বোঝায়। বেদ তো বৈদিক গ্রন্থই।

অধ্যাত্ম রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দেখা যায় শ্রীবিষ্ণুর ৭ম অবতার শ্রীরাম ব'লেছেন,—'আমার পূজনে জাতি, বিদ্যা, ধন ও রূপের কোন ভেদাধিকার নেই।'

'তেষু জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ক্রিয়াদি ফেদঃ মা অস্তি।'

বিষ্ণুর ৯ম অবতার শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন,—"হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় ক'রে নারী, বৈশ্য, শূদ্র, পাপযোনি জাত নিষাদাদি ও অন্ত-জরাও পরমগতি লাভ ক'রে থাকে।"

'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিযো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥"

ঋক্‌বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টাদের মধ্যে ২৬ জন স্ত্রী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হ'লেন—(১) সরমা, (২) ইন্দ্রাণী, (৩) মমতা, (৪) সূর্য্যা, (৫) বিশ্ববারা আয়েত্রী, (৬) নদী, (৭) অপলা আয়েত্রী, (৮) ইন্দ্রমাতা, (৯) গোধা (১০) উপনিষদ, (১১) ঘোষা কাক্ষিবতী, (১২) রমোজায়া, (১৩)

মেধা, (১৪) উর্ব্বশী, (১৫) লোপামুদ্রা, (১৬) শ্রী, (১৭) নারী শাশ্বতী (১৮) অদিতি, (১৯) ব্রহ্মজায়া জুহু, (২০) শ্রদ্ধা. (২১) যমী, (২২) বাক্ (শ্রীচণ্ডীর দেবীসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা), (২৩) কবয়ঐলুষ, (২৪) লাক্ষ, (২৫) দক্ষিণা ও (২৬) সার্পরাজ্ঞী। তাছাড়া রমণী বাঘম্বরী ছিলেন একজন প্রসিদ্ধা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। গার্গী, গৌতমী, মৈত্রেয়ী, চাকৃনবী প্রমুখা রমণীগণও বেদজ্ঞা ও ব্রহ্মবিদ্যায় খুবই পারদর্শিনী ছিলেন।

সে যুগে বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের এক বিশেষ রীতি পরিলক্ষিত হ'ত ;—তা হ'ল, এই সব যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান একজনে ক'রতো না। এই যজ্ঞ যারা ক'রতেন বা উপাচারের আয়োজন ক'রতেন তাদের বলা হ'ত যজমান। যজমানের হ'য়ে যারা যজ্ঞ পরিচালনা করতেন তাদের বলা হ'ত ঋত্বিক। যজ্ঞকর্ম্মে ঋত্বিকদের বিভাগ ছিল। যিনি বেদীতে তথা যজ্ঞস্থণ্ডিলে কাঠে আগুন জ্বেলে ঘি ও অন্যান্য দ্রব্য সহযোগে আহুতি প্রদান ক'রতেন তাঁকে অধ্বর্য্য, ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যিনি আবৃত্তি সহযোগে সূক্ত পাঠ ক'রতেন তাঁকে হোতা, আর যিনি গান ক'রে সুক্ত পাঠ ক'রতেন তাঁকে উদ্গাতা বলা হ'ত। বৈদিক যুগে স্ত্রী ঋষিরাও যজ্ঞের ঋত্বিক হ'য়ে যজমানের যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা ক'রতেন যার বহুল উল্লেখ মেলে।

তাছাড়া তোমার তথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন রাধা, ললিতা, বিশাখা, শ্রী প্রভৃতি গোপীরা।

শাস্ত্র, প্রজ্ঞাবান ঋষিরা ও অবতার পুরুষেরা রমণীদের অধিকার দান ক'রেছেন। এর পর কি বলা যায় রমণীরা বেদপাঠে অধিকারিণী নয়?

আমার এ সব কথা যে সবাই মেনে নেবেন সে কথা নিশ্চয়ই না। বিশেষ ক'রে, যারা সিংহীর চেয়ে কেশরওয়ালা সিংহের গর্জনে, মুরগীর চেয়ে লোলক নাড়া মোরগের প্রহরে প্রহরে উচ্চস্বরে ডাকে,

ময়ূরীর চেয়ে পুচ্ছওয়ালা ময়ূরের কেকা রবের মধ্যে বিশেষ এক পৌরুষত্বের ইমেজ খুঁজে পান, বেদপাঠের নিজেদের আভিজাত্য রাখার তাগিদে দাঁড়ি গোফে তা দিয়ে তেড়ে এসে তারা বলবেন,—"ব্যাটা একেবারে স্ত্রৈন। না হ'লে নারীদের এমন ক'রে তুলে ধরে?" শাস্ত্রের কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েও হয়তো ব'লবেন তারা—"ব্যাটা এটা বোঝে না যে ক্ষীণ কণ্ঠা নারী বেদপাঠে অধিকারিণী হয় না।" আসলে এখানে বেদপাঠে অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন না তুলে যদি যোগ্যতা ও অযোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে তাহ'লে ব'লতেই হয় অনেক রমণীর ক্ষীণ কণ্ঠে হয়তো বেদমন্ত্রের নির্ঘোষ উচ্চারণ যথাযথ ধ্বনিত হওয়া সম্ভব নয়, সেটা কিন্তু নারীদের প্রকৃতিগত শারীরিক নূ্যনতা মাত্র—অযোগ্যতা কিংবা অনধিকারের প্রশ্ন নয়।

শক্তির আবির্ভাবের যেমন একটা রীতি আছে, অবতারের অবতরণের তেমনি একটা ধারা আছে। রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্যে সত্ত্বগুণ যখন হয় অবহেলিত, সাধু হয় লাঞ্ছিত, সত্য হয় লুণ্ঠিত, তখনই ধর্মে আসে গ্লানি। আর সেই ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে ও সাধুদের রক্ষার্থে অবতার অবতীর্ণ হন—যা একটু আগেই আলোচনা ক'রেছি। এই ধরার ধূলিতে আবির্ভাব ঘটে নররূপে, পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে, পতিরূপে ও প্রভুরূপে। এখন সহজেই প্রশ্ন উঠবে ধর্ম্ম কি?

ধৃ + মন্—ধরতি লোকং। যা সমগ্র জীবনকে ধারণ করে তাই ধর্ম্ম—সে গৃহনীতি হোক, সমাজনীতি হোক, অর্থনীতি হোক—হোক না ঐহিকতা বা পারত্রিকতা—সবই বৃহত্তর ধর্ম্মের অংশ মাত্র। ধর্ম্ম হলো স্বচ্ছ জ্ঞান ও কর্ম্ম যা দিয়ে মানুষ তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। জ্ঞানের দ্বিবিধ ভাব—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। বিজ্ঞান প্রতিটি জিনিসকে দেখে খণ্ড খণ্ড ভাবে, আর দর্শন দেখে সামগ্রিক-ভাবে। বিজ্ঞানের দৃষ্টি খণ্ডের দিকে এবং দর্শনের দৃষ্টি অখণ্ডের দিকে। দার্শনিক জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের দুটি ধারা আবহমান কাল

থেকে ফল্গুর মতো ব'য়ে চ'লেছে ভারতের বুকে—একটি হ'ল বৈদিক, অপরটি তান্ত্রিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুঃখের কথা আজকাল কিছু কিছু লোকের মুখে শোনা যায়—"আমরা ধর্ম্ম-টর্ম্ম মানি না।" অবশ্য তারা বুঝে বলেন কিংবা না বুঝে বলেন জানিনা, এসব ক্ষেত্রে আমার ধারণা হ'ল যে তারা ধর্ম্ম মানেন না নয়, ধর্ম্ম মানার মতো তাদের দৈহিক ও মানসিক কোষগুলির বিকাশ ঘটেনি মাত্র। মানুষের দেহে যে (১) অন্নময়, (২) প্রাণময়, (৩) মনোময়, (৪) বিজ্ঞানময় ও (৫) আনন্দময় প্রভৃতি পাঁচটি কোষ র'য়েছে, তা কিন্তু পশুদেহে থাকে না। পশুদেহে কেবলমাত্র অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও খানিকটা মনোময় কোষের আভাস দেখা যায়। তাই তারা প্রকৃতির নিয়মে খাওয়া-দাওয়া, ঘুমনো, শত্রুহাত থেকে নিজেকে রক্ষার্থে যুদ্ধ, বংশ-বিস্তার প্রভৃতি কাজ সম্পাদন ক'রে থাকে। মানুষের মধ্যে আরও তিনটি কোষ তথা মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের বিকাশ সম্ভব হয় ব'লেই খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়, থাকার ব্যবস্থা, বংশবিস্তার প্রভৃতি নিয়েই ব্যস্ত থাকে না--সে আরও কিছু ক'রতে চায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানেও এর সম্মতি মেলে। এই বিজ্ঞান বলে দেখা যায় সমস্ত প্রাণীর মস্তিষ্কেই Thalamus আছে। কিন্তু কেবলমাত্র মানুষের মস্তিষ্কেই Hypothalamus নামে একটি বিশেষ গ্রন্থি আছে, যার সাহায্যে সে বিচার বিবেচনা ও বিবেকের দ্বারা বহু কাজই সম্পাদন ক'রতে পারে। প্রাণীজগতের ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানুষ-রূপে জন্মগ্রহণ করার ফলে সহজাত ভাবে এই কোষগুলি তার মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু কোষগুলির বিকাশলাভ ঘটে না। বহুজন্মের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই কোষগুলি পায় পূর্ণতা! মনোময় কোষের পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের ধর্ম্মপথে প্রবেশ অধিকার জন্মায় না বা আস্তিক্যভাব প্রকাশ পায় না। মানুষের জন্য মানুষের দ্বারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশই ধর্ম্ম। যার থেকে জাগে মানবিক মূল্যবোধ।

কুসংস্কার, অপলব্ধি, অপব্যাখ্যা অজ্ঞানতায় মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে অসৎ প্রবৃত্তির বশীভূত যখন হয় তখনই দেহস্থ সৎ প্রবৃত্তিগুলি হয় নির্ব্বাসিত দেহ-স্বর্গ থেকে, ধর্ম্মে আসে গ্লানি। আজকে মানুষ ঋতকে হারিয়ে রীতিসর্বস্ব হ'য়ে উঠেছে, তাই ধর্ম্ম তাদের রাজপথে না এনে অন্ধকার দুর্গন্ধময় এক গলিতে এনে পৌঁছে দিয়েছে। ধর্ম্ম আজ মানুষের কাছে মিলনের সেতু না হ'য়ে বিচ্ছেদের নদী হ'য়ে উঠেছে। এর থেকে উদ্ধার পেতে হ'লে আমাদের বিদ্রোহ ক'রতে হবে—বিদ্রোহ ক'রতে হ'বে অবচেতন মনের বিরুদ্ধে সচেতনতার, অপলব্ধির বিরুদ্ধে উপলব্ধির, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংস্কারের, অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের; তবেই জাগবে সুপ্ত মানবিক সত্তা—যাকে Divinism বলা হয়। এর জন্য চাই—সৎ কর্ম্ম, তপস্যা বা সাধনার। সাধনা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কল্পনার বিলাস, পাণ্ডিত্যের প্রকাশ কিংবা বুদ্ধির কলাকৌশলের প্রয়োগ নয়। এ হ'ল—শ্রীগুরু-কৃপা তথা ভগবৎ-কৃপা। বহুসাধের অভিপ্রেত এ জীবনটাকে একটি বিশেষ সাধের মধ্যে আনার নামই *সাধনা। শ্রীগুরুকৃপা হ'ল বীজ বা নাম, সাধনা-হ'ল গাছ, ফল তথা ভাগবৎ দর্শন। ব্যাকুলতা থেকেই আসে গুরু-কৃপা, ক্রমে তা স্ফুরিত হয় সাধনারূপে। ব্যাকুল আমরা সবাই-কেউ অর্থের জন্য, আবার কেউ পরমার্থের জন্য। কি অন্তরে, কি বাহিরে এ ব্যাকুলতা এনে দেয় কর্মে গতি এবং কর্মের উপাদান কারণ। তপস্যা বা সাধনা কিন্তু ভগবান ধরার ফাঁদ নয়। কারণ ভগবান ধরার কোন ফাঁদ নেই। তাঁকে ধরা যায় না, তিনি ইচ্ছা ক'রে ধরা না দিলে।

আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় কঠোর তপস্যা বা সাধনার প্রভাবে ভাদ্রের কৃষ্ণা-অষ্টমী তিথির ঘনঘটাচ্ছন্ন ঘোর রজনীতে পাহারা বেষ্টিতা বদ্ধ কারাকক্ষে শৃঙ্খলিতা, তপস্যারতা সাধিকা দেবকীর হৃদয় আলোকিত ক'রে তিনি এসেছিলেন কৃষ্ণ হ'য়ে। কিছু আগেই

আলোচনা ক'রেছি তাঁর দিব্যভাবে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণের কথা। এই ভাদ্র মাসেই বা তাঁর জন্ম কেন? প্রকৃতির রাজ্যে ভাদ্রমাস হ'ল জড়মাস। জড়বিজ্ঞান থেকেই নাস্তিকতার জন্ম; আর নাস্তিকতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে আস্তিকতার বীজ। নাস্তিকতার চরমভাবে পৌঁছলেই আসে তাঁর আবির্ভাব লগ্ন। চন্দ্রকলার ক্ষয়শীল পক্ষের নাম কৃষ্ণপক্ষ। জ্যোতিষবিজ্ঞানে চন্দ্রকে মনের অধিপতি ব'লে ধরা হয়। অষ্টমীতে চন্দ্র অর্ধক্ষীণ হয়। মনের অর্ধাংশ তাঁর চরণে অর্পিত হ'লে, দেহে আসে অল্প অল্প সমাধিভাব। সাধক তাঁকে দেহ-মন্দিরে উপলব্ধি করতে শেখে। দিনের বেলায় মন ছুটে যায় বহুর দিকে, ভেদের দিকে, ছুটে যায় জাগতিক কর্ম্মকাণ্ডের দিকে; আর রাত্রে ফিরে আসে একের দিকে, লয়ের দিকে, নিজের দিকে, পরমাত্মার দিকে। পরমাত্মা থেকে স্ফুরিত হ'য়ে জীবাত্মার জাগতিক আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা কতকটা রাত্রির মতো, এই রাত্রিতেই তাঁকে পাওয়ার প্রকৃষ্ট সময়। তাই এ পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল ঘোর রজনীতে।

ভোগবাসনাময় শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ষড়রিপু-রূপ প্রহরী বেষ্টিতা সংসার কারাগারে আবদ্ধ সাধনারতা সাধিকা দেবকী* সাধনায় গভীর রাত্রেই তার হৃদয় মন্দিরে লাভ ক'রেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে।

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ; সৎ-চিৎ-আনন্দ। সৎ-তাঁর সন্ধিনী শক্তি, চিৎ-তাঁর সম্বিৎ শক্তি ও আনন্দ তাঁর আহ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ।

সন্ধিনী তথা কর্ম্ম, সম্বিৎ তথা জ্ঞান, আহ্লাদিনী তথা প্রেম। *বৃন্দাবনে তাঁর আহ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ, যেখানে তিনি প্রেমঘন শ্যাম। তাঁর শ্রীপ্রেম দেবকী, বসুদেব, যশোদা, নন্দ বাৎসল্যভাবে, সুবল, শ্রীদাম, সুদামাদি সখ্যভাবে, কালনাগের পত্নীগণ দাস্যভাবে,

টীকা:—* সাধনা হ'ল নিজের অনুভূতিকে স্বেচ্ছামত আকারে স্বারূপ্যদিবার অধিকার।

আর রাধা, বিমলা, সুকেশী, ললিতা, শ্রীমতী, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণ মধুরভাবে উপভোগ ক'রেছেন। গোপী মানে কিন্তু গোয়ালার স্ত্রীলিঙ্গে গোয়ালিনী নয়। গোপী অর্থে যিনি এই সংসারে চিদাদি শক্তিবলে সংসারকে রক্ষা বা গোপন ক'রেন তিনিই গোপী।

মথুরায় ও দ্বারকায় তাঁর 'সন্ধিনী' শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। সেখানে তিনি প্রতাপ ঘনশ্যাম। কংস, শিশুপাল প্রভৃতি দুষ্টের ক'রেছেন দমন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্ব-আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে অর্জুনের মনে জেগেছিল বিষাদ। যুদ্ধ না করার জন্য *অর্জুন নিরস্ত হ'লে, তিনি অর্জুনকে সাংখ্য, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, মোক্ষ প্রভৃতি বর্ণনা ক'রে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন পুনরায় যুদ্ধ ক'রতে। কুরুক্ষেত্রে তাঁর সম্বিৎ শক্তির প্রকাশে হ'লেন তিনি জ্ঞান ঘনশ্যাম।

আলোচ্য বিষয়ে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের প্রজ্ঞা-উক্তিতেই উদ্ভব হ'ল জ্ঞান-বীজের তথা গীতাবীজের। বীজ যেমন মাটিতে রসাদি পেয়ে তার অব্যক্তভাব থেকে অঙ্কুরোদগম হ'য়ে ক্রমে বাড়তে বাড়তে বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনি অশোচ্য বিষয়ে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের প্রজ্ঞা-উক্তিরূপ বীজ থেকেই ক্রমে গীতা বৃক্ষের হ'য়েছে সৃষ্টি তাই শ্রীভগবানের অর্জুনের প্রতি উক্তি—"অশোচ্যান—ন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" হ'ল গীতার বীজ।

বীজের অঙ্কুরোদগম থেকে আরম্ভ ক'রে পূর্ণবৃক্ষরূপে পরিণত

টীকা:—৯৬ পৃঃ বৃন্দাবন: শ্রীকৃষ্ণের সুখ আস্বাদন যে স্থানে বা যে অবস্থায়, নিত্য প্রেম বাধাহীন, সে স্থান বা অবস্থার নাম বৃন্দাবন। বৃন্দাবন হ'ল এমনই স্থান যেখানে চিন্ময় ভগবানের নিত্যপ্রকাশে আহ্লাদিনীর সার প্রেমের বাধাহীন বিজয় ঘোষণা করে।

* অর্জ্জুন হল পাণ্ডুর তৃতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র। অর্জ্জুন = অর্জ + উনন্ কর্ত্ত সংস্কারবদ্ধ জীব।

হ'তে যা উদ্রিক্ত ক'রে তা হ'ল শক্তি। সংসারের প্রতি বিরূপ বৈরাগ্য না জাগলে ও অভ্যাসসিদ্ধ না হ'লে শক্তির বিকাশ হয় না।

শক্তিকে জাগ্রত ক'রতে হ'লে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করলেই জন্মাবে বৈরাগ্যভাব ; এবং শরণাগতির জন্য দরকার হবে অভ্যাসের।

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশবাণী—

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—হ'ল গীতার শক্তি তত্ত্ব।

শ্রীগীতা রচিত হ'য়েছে অনুষ্টুপ ছন্দে ; যার চার চরণ। প্রতি চরণে আট অক্ষর অর্থাৎ মোট অক্ষরসংখ্যা হ'ল বত্রিশ। অনুষ্টুপ এমন একটি ছন্দ যার মধ্যে র'য়েছে ভববন্ধন মোচনকারী শক্তি। অনুষ্টুপের অর্থ হ'ল সরস্বতী তথা জ্ঞান। অনুষ্টুপ=অনু+স্তুভ। স্তুভ-ধাতুর অর্থ হ'লো স্তব্ধতা বা রহিত হওয়া। অনুষ্টুপ ছন্দের শক্তি কার্যকরী হ'লে পাঠকের মন বিষয়-কামনা-বাসনা থেকে রহিত হ'য়ে হয় অন্তর্মুখীন।

ছন্দ-গতি পরিণতি ভেদেই এ জগতে বিভিন্ন রকম পদার্থগুলির হয় উৎপত্তি। পদার্থ বলা হয় কাকে ? যার পদ অর্থাৎ অস্তিত্ব আছে—আছে অর্থ তথা অনুভূতিরূপ তরঙ্গ ভঙ্গ সৃষ্টির ক্ষমতা বা শক্তি, তাকেই বলা হয় পদার্থ। পদার্থকে আবার দুভাগে বিভক্ত করা হয়—(১) জড় পদার্থ ও (২) চেতন পদার্থ। চেতন পদার্থের মধ্যে প্রাণ তথা শক্তি নিহিত আছে এটা সর্ব্বজন বিদিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল Energy and Matter এই দুইটির প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। Energy-র প্রকাশ মাধ্যম হ'ল Matter. জড় পদার্থে শক্তির অস্তিত্ব থাকে না। কয়েক হাজার বছর আগে আমাদের প্রজ্ঞাবান ঋষিরা জড় পদার্থের মধ্যে শক্তির অবস্থিতি ও বিন্যাস দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের জ্ঞানদৃষ্টিতে, যাকে সাধারণ ভাষায় বিজ্ঞান বলা যায়। ঋষিদের ভাষা ছিল ভাবপ্রবণযুক্ত ; তাই

বিজ্ঞানের চরম শিখরে উঠে, তাঁরা ব'লেছিলেন পরমশক্তির বিকাশ এ পৃথিবীতে সর্ব্বত্র অনুভূত হয়—কি জড়ে বা কি চেতনের মধ্যেও। বিজ্ঞানের কিছু আবিষ্কার ক'রতে প্রথমে একটা কিছুর উপর ভিত্তি ক'রে একটা অনুমান-সিদ্ধান্তে আসেন বিজ্ঞানীরা, যাকে Hypothesis বলা হয় ; তারপর তারা আনুষ্ঠানিক কাজের মধ্যে দিয়ে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বার করেন, যাকে Practical বলা যায়। শুধুমাত্র আনুমানিক জ্ঞান কিংবা শুধুমাত্র Practical Work-এ, এর সমাধান সূত্র মেলে না। এর জন্য চাই—আনুমানিক সিদ্ধান্ত ও Practical Work-এর যোগসূত্রের সমন্বয় ; তবেই পাওয়া যায় সঠিক জ্ঞান বা বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত।

গীতার সাংখ্যযোগ হ'চ্ছে অনুমান-সিদ্ধান্ত জ্ঞান, আর কর্ম্মযোগ হ'চ্ছে অনুষ্ঠান-সিদ্ধ জ্ঞান। শুধু অনুমান-জ্ঞানে কিংবা শুধু অনুষ্ঠান-কর্ম্মে সুফল প্রাপ্তি ঘটে না। অনুষ্ঠান ও অনুমান এক হ'য়ে যে জ্ঞান হয় তাই হ'ল গীতার জ্ঞানযোগ তথা বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত। এই জ্ঞানযোগ বলেই প্রজ্ঞাবান ঋষিরা ইট, কাঠ, পাথর ও ধাতুর পদার্থের মধ্যে শক্তি তথা প্রাণের আভাস পেতেন ব'লেই ঐ সকল পদার্থ দিয়েই তাদের মধ্যে মূর্ত্ত দেবতাদের মূর্ত্তি গ'ড়ে তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রতেন। পদার্থের মধ্যে দুটি জিনিষ বর্ত্তমান,—তা হ'ল, (১) অস্তিত্ব ও (২) স্পন্দন। মজার ব্যাপার হ'ল যদি কোন পদার্থ স্পন্দনতরঙ্গ না তোলে, তাহলে তার অস্তিত্ব অনুভূত হ'বেই না মানুষের কাছে। এ বিশ্বে সকল পদার্থের স্পন্দন তরঙ্গ আমাদের প্রাণে তরঙ্গাঘাত ক'রে ব'লেই আমাদের অনুভূতিতে আসে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি স্পন্দনের বিভিন্ন মাত্রায়। মানুষের মধ্যে তার নিজস্ব রূপ, রস গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি স্পন্দন তরঙ্গ বর্ত্তমান থেকে বাইরের নানারকম স্পন্দন তরঙ্গ এ পাঁচটি স্পন্দনকে পাঁচভাবে আঘাত ক'রে, সেই আঘাতের কমবেশী পরিমাণে

পদার্থগুলি কখনও কখনও মানুষের অনুভূতিতে আসে, আবার কখনও আসেও না। আসে না মানে কিন্তু নেই না, পদার্থ ঠিকই আছে—আছে তার অস্তিত্ব, তার স্পন্দনও ; তা কিন্তু তার অবস্থান্তর অবস্থায়। এই অনুভূতিই হ'ল চেতনা, যাকে শাস্ত্রে চিৎশক্তি বলে।

ছন্দের গতিপাত স্পন্দন থেকেই সৃষ্টি হয় এক এক দেবতা তথা চেতনার, এক এক তত্ত্বের, এক এক ভাবাপন্ন মানুষের, এক এক প্রকার জীবজন্তুর, পশুপাখীর ও এক এক রকম পদার্থের।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন জড় পদার্থের মধ্যেও চলে শক্তির লীলা। জড়-পরমাণু কেন্দ্রে Nucleus এ থাকে Positive বাহিত কণিকা যাকে ইংরাজীতে Proton বলে ও অনাহুত কণিকা যার ইংরাজী নাম Neutron। ঐ Proton ও Neutron কে ঘিরে চলছে আবর্ত্তন Negative তড়িতাত্মক Electron এর নানান ভঙ্গিতে। এ যেন ঠিক বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে রেখে গোপীদের বৃত্তাকারে নানান ভঙ্গিতে নৃত্য—মহারাস। এ যেন হৃদয় মন্দিরে প্রাণকৃষ্ণকে স্থাপন ক'রে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি অষ্টসখীর নৃত্যবর্ত্তনে দেহকে চলমান ক'রে রাখা।

আসলে Energy পরমাণু কেন্দ্রেই থাকে। পরমাণুর বিচ্ছুরণ ঘটলে শক্তি তার থেকে মুক্ত হ'য়ে তাপ ও তেজরূপে বিকীর্ণ হ'য়ে পড়ে। ঐ নিঃসারিত শক্তিই পারমাণবিক শক্তি বা Atomic Energy। Law of Inertia অনুসারে পদার্থের ধর্ম্ম স্থির ও তার অবস্থাব পরিবর্তন ঘটে না. যদি কোন শক্তির সাহায্যের বিক্ষেপ না ঘটে। প্রাণীদেহ জড় পদার্থে গড়া ; তাহলে প্রাণীদেহও জড়তার নিয়মের বাইরে নয়। কিন্তু আইনষ্টাইনের 'Conservation of Energy'-র মূল তত্ত্ব হ'ল জড় ও শক্তির অবিনশ্বরতা। শক্তি থেকে পদার্থে ও পদার্থ থেকে শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া মোটেও অসম্ভব নয়।

এ জগতে যে কোন পদার্থের পরিবর্ত্তন হোক না কেন—তাতে জড়কণা ও শক্তির পরস্পরের রূপান্তর ঘটবেই—তা পরিমাণে কম আর বেশী। এই সূত্র অনুযায়ী জড় ও শক্তি হ'ল—একই প্রকৃতির দুইটি সত্তামাত্র, যা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক থেকে একটি থেকে অপরটির সৃষ্টি হ'তে পারে। আইনষ্টাইনের এই সূত্র আবিষ্কারের প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে জ্ঞানযোগবলে, ভক্ত প্রহ্লাদ পাথরের স্তম্ভকে পিতা হিরণ্যকশিপুকে দেখিয়ে ব'লেছিলেন,—"এই স্তম্ভের মধ্যেও শক্তি তথা Energy তথা শ্রীহরি বর্ত্তমান।" তা-শুনে রাজা হিরণ্যকশিপু প্রস্তর নির্ম্মিত গদা ঐ প্রস্তর স্তম্ভে আঘাত ক'রলে পারমাণবিক শক্তি বা Atomic Energy'র বিস্ফোরণ ঘটে যা শাস্ত্রে প্রস্তরখণ্ড থেকে নরসিংহ মূর্ত্তির আবির্ভাবে তার প্রাণ-নাশের কথা বলা হ'য়েছে।

সূর্য্যবিজ্ঞানও এই কম্পনাত্মক তরঙ্গের উপর বিশেষ নির্ভরশীল। সূর্য্যরশ্মি হ'ল প্রাণশক্তির উৎস। সূর্য্য থেকে যে রশ্মি প্রতিফলিত হয় এ পৃথিবীতে তা হ'ল Heat Vibration বা তাপ কম্পন তরঙ্গ।

Heat Wave Vibration বা তাপ কম্পন তরঙ্গ ঃ—মানুষের দেহের উপরে কিংবা ভৌতিক পদার্থগুলির উপরে সব সময় Cosmic Ray পতিত হচ্ছে। এই Cosmic Ray'র মধ্যে প্রাথমিকভাবে থাকে Proton, কিন্তু তাঁর গতিবেগ এত প্রবল থাকে যে Proton ব'লেই চেনা যায় না, গৌণ পর্য্যায়ে Electron ও Neutron এর অস্তিত্বও মেলে। এ পৃথিবীতে জন্মাগ্নিকারে মানুষের নিজস্ব ছন্দ বা তরঙ্গের সঙ্গে বা কোন সৃষ্ট পদার্থের নিজস্ব ছন্দ বা তরঙ্গের সঙ্গে Cosmic Ray-র তরঙ্গাঘাতে মানুষের নিজস্ব ছন্দের ব্যাঘাত ঘ'টে দৈহিক ও মানসিক বিকার ঘটতে দেখা যায়। কোনপ্রকার পদার্থের মধ্যে বা কোন স্তরের মানুষের মধ্যে কোন ছন্দ বা কম্পন তরঙ্গ বর্ত্তমান কিংবা কার পক্ষে কোন্ জাতীয় ছন্দের তথা কম্পন-তরঙ্গের প্রয়োজন বা কল্যাণকর তা ভাল ক'রে জেনে অথবা যে চেতনা শক্তির কথা

আগেই বলেছি তার দ্বারা মানুষের দেহস্থ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চভূতে (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) দেহ কিংবা কোন ভৌতিক পদার্থ বা বস্তু কোন্ ছন্দে বা কম্পন তরঙ্গে উৎপন্ন হ'য়েছে বা দেহের কিংবা পদার্থের বর্ত্তমানস্থিত ভাবগুলির কম্পন কিভাবে কোন্ উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত, তা জেনে নিয়ে সেই কম্পনের মাত্রা ও পরিমাণমত Heat Wave Vibration (যা সূর্য-রশ্মি থেকে উদ্ভূত) বা তেজ কম্পন বিশেষ Lens কিংবা প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহে বা বস্তুর উপর প্রতিফলিত ক'রে শারীরিক কিংবা মানসিক ব্যাধি নিরাময়, ভৌতিক বস্তু বা পদার্থের আকার পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ঘটানো হ'য়ে থাকে। সূর্য্যবিজ্ঞান জ্ঞাত যোগীরা শ্রীগুরু পরম্পরায় লব্ধ জ্ঞান ঐ পদ্ধতির সাহায্যে অনায়াসেই এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তর, দুর্গন্ধ বা নির্গন্ধকে ইচ্ছামত সুগন্ধে ও মানুষের বিভিন্ন দেহ ও মনের রোগকে নিরাময় ক'রতে সমর্থ হন।

Heat Wave Vibration বা তাপ-কম্পন তরঙ্গ প্রতিফলনের জন্য প্রয়োজন হয় চোখের বিন্দুর তীব্র ক্ষমতা যা যোগায় মানুষের দৃষ্টিশক্তি। প্রাণধারণের জন্য জীব বাইরের যে বায়ুকে আকর্ষণ ক'রে শ্বাসকার্য্য সম্পাদন করে তা হ'ল কালের অণু। চোখের বিন্দুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নামে দুটি ক্ষমতা আছে। আকর্ষণ ক্রিয়াবলে মানুষ সেই কালের অণু তথা শ্বাসবায়ু গ্রহণ ও পরিত্যাগ ক'রে থাকে ; আর বিকর্ষণ ক্ষমতায় তার জাগতিক দৃশ্যাবলীর দর্শন ঘটে। চোখ বন্ধ অবস্থায় বিকর্ষণ ক্ষমতা ক্রিয়াশীল না থাকলেও, আকর্ষণ ক্ষমতা সদা সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল থাকে। সূক্ষ্মদেহে বিচরণশীল যোগী মাত্রেই জানেন যে, চোখই হ'ল মানুষের *স্থূল দেহ থেকে *সূক্ষ্মদেহে নির্গম

টীকা :—** স্থূল, সূক্ষ্ম ও করণ ভেদে মানুষের দেহের তিন অবস্থা র'য়েছে। বিজ্ঞানের মতে মানুষের শরীর হ'ল পরমাণুর সমষ্টি, Proton ও

ও প্রবেশের সহজতম পথ। চোখের এই আকর্ষণ ক্ষমতাবলে সূর্য্য-কিরণ থেকে তাপ কম্পন ধ'রে নিয়ে বিশেষ এক Lens এর সাহায্যে বা ক্রিয়াবলে পার্থিব যে কোন ভৌতিক দ্রব্যের উপর প্রতিফলিত ক'রে সেই দ্রব্যের আকার প্রভৃতির রূপান্তর ঘটানো হ'য়ে থাকে।

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি সপ্ত গ্রহতত্ত্ব, অগ্ন্যাদি সপ্ত দেবতাতত্ত্ব ও দেহস্থ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র সপ্ত প্রাণতত্ত্ব রসায়ন শাস্ত্রের (১) Sodium Oxide. (২) Calcium Oxide, (৩) Copper Oxide, (৪) Zinc Oxide, (৫) Aluminium Oxide, (৬) Ferric Oxide ও (৭) Carbon Dioxide প্রভৃতি সাতটি Oxide এর অনুপাত তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করে না কি?

এই সূর্যবিজ্ঞানের ক্রিয়া সম্পাদনের সাহায্যে আমার পরম গুরুদেব যোগীরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেব (কাশীর গন্ধবাবা) নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করতেন। তদানিন্তনকালের বহুগুণীজনেরা তা দেখে মুগ্ধ, চমৎকৃত ও আশ্চর্য্যান্বিত হ'তেন যা তখনকার পত্র পত্রিকায় উল্লেখ পাওয়া যায়।

Electron এর আবর্ত্তন। Proton এর চারিদিকে বৃত্তাকারে Electron এক সেকেণ্ডে বহু লক্ষ বার ঘোরে। মানুষের দেহের মধ্যস্থ এই সূক্ষ্ম দুটি অণু তথা প্রোটোন ও ইলেকট্রনের মধ্যে রয়েছে অনেক ফাঁক। মানুষের দেহের মধ্যে যত অণু আছে তাদের Proton ও Electronকে এক করলে অর্থাৎ মধ্যের ফাঁককে বাদ দিয়ে এক সঙ্গে করলে উপাদানের পরিমাণ হয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ভারী স্থূলদেহ থেকে দেহের লঘু হ'য়ে যাওয়া বিজ্ঞান মতে কিছু আশ্চর্য্য কি? পাতঞ্জল দর্শনের ৪২-এর সূত্রটি পড়লে এর সম্বন্ধে অনুমান করা যাবে। ভারী দেহে লঘু হ'য়ে শূন্যে উঠাকেই উদ্বেগাত্রীতি বলেন বৌদ্ধরা, আবার এই শূন্যে উঠার জন্যই খ্রীষ্টানদের চল্লিশ জন সেণ্ট হয়েছিলেন। যোগের মাধ্যমেও শরীরকে লঘু করে শূন্যে উঠা যায়।

স্বপ্নামৃতশ্রুতি গ্রন্থটির পর্য্যালোচনা

শ্রীচণ্ডী ও শ্রীমৎ ভগবদগীতা এই দুই ধ্রুবাদী মহাগ্রন্থযুগল ভারতীয় অধ্যাত্ম ভাবনার তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও আনুষ্ঠানিক আচরণ গত—উভয়ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ ক'রে শ্রীগীতার সাম্প্রদায়িক ভাষ্য-টীকা অনেক এবং বহু মণীষী ভাবুকের রচিত অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাও প্রচুর। পরম্পরাক্রমে উত্তরকালের ব্যাখ্যা ভাষ্যগুলির মধ্যে পূর্বসূরীগণের বিশ্লেষণের স্বাদ সেই নবনব উপলব্ধি সুরভিত আস্বাদনের মাধুর্য্য ও আগ্রহী পাঠকগণের আচরণশীল মহার্ঘ সম্পদ। আচার্য্য বসু দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় ধারার সঙ্গে নিজ প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি রসমণ্ডিত ক'রে শ্রীচণ্ডী বোধাত্মিকা গ্রন্থটি রচনা করলেন। লাভ হ'ল শাক্ত ভাবনার একটি স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল অভিনব সংযোজন।

এই সূত্রেই আচার্য্য বসুর অন্তরে গীতাচিন্তার উন্মেষ হ'ল যার বিকশিত রূপ 'স্বপ্নামৃতশ্রুতি'। জাগ্রত অবস্থায় সচেতন প্রয়াস জ্ঞান গভীর ও একাগ্র চিন্তনের নাম ধ্যান—আর অবচেতনের সেই প্রয়াস বা বাসনাজাত যে ভাব-ভাবনা তার সাধারণ আখ্যা স্বপ্ন। নিদ্রাকালে মানসিক সংযম বা শাসন শিথিল থাকে ব'লে এই স্বপ্নগুলি অধিকাংশই প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে হ'য়ে থাকে অসংলগ্ন কিম্ভূতকিমাকার বস্তু। কিন্তু সাধক পুরুষের চিত্তে কোন বাসনা গভীর ও একাগ্র হ'লে স্বপ্ন ছদ্ম আবরণের একটি অবয়ব গ্রহণ করতে পারে। এটা বাহ্য। আসলে এটি সিদ্ধ পুরুষের মগ্নচৈতন্য রহস্যময় আত্মজিজ্ঞাসা। সাহিত্য বিচারে এই অভিনব প্রকাশ রীতিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ স্বপ্নাশ্রিত রচনা খানিকটা লঘু রসাশ্রিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু 'স্বপ্নামৃতশ্রুতির' স্বপ্নধারা একেবারেই—বিষয় গাম্ভীর্যে ও সৌরভে অনন্য। শ্রীগীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত-ভাগবতাদি প্রধান গ্রন্থের ধর্ম্মাত্মক সমন্বিত-রূপটিকে গভীর ধ্যান মগ্নতা মণ্ডিত ক'রে একটি সদর্থক সত্যে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন লেখক। প্রকাশ রীতি হিসাবে এটি অভিনব বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যে ও সৌরভে, এ ঐশ্বর্য ও স্বাদুতা প্রতি পাঠকের কাছে বরেণ্য হবে ব'লে মনে করি। 'শ্রীচণ্ডী বোধাত্মিকা' ও 'স্বপ্নামৃতশ্রুতি' গ্রন্থ দুটি ঐতিহ্য ধারার সঙ্গে সমন্বিত ক'রে আধ্যাত্মিক সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে সংযোজিত করেছেন লেখক।

ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী
প্রাক্তন বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ বাংলা বিভাগ
এবং কলাবিভাগের ডীন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।